আয়নার মধ্যে একা

বুদ্ধদেব বসু

সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ১২

'আয়নার মধ্যে একা'-র প্রথম লেখন ১৯৬৭-র শারদীয় সংখ্যা 'রূপম'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। বইয়ে অনেক নতুন অংশ যোগ করা হয়েছে।

বু. ব.

কলকাতা
অক্টোবর, ১৯৬৯

আয়নার মধ্যে একা

১

সকাল আটটা। আকাশ নীল, আকাশে রোদ্দুর, অঘ্রান মাস। মাঝে-মাঝে নরম হ'য়ে শানাই। লোকজন, ব্যস্ততা। কিন্তু তার কিছু করার নেই, সে বিয়ের কনে। পুরো হিন্দুমতে বিয়ে, শেষরাত্রে গায়ে-হলুদ থেকে শুরু, বেশ ঘটাপটা। তাকে বসিয়ে রেখেছে তেতলার এই ঘরটায়, বার্নিশের গন্ধওলা নতুন খাট, কোরা কাপড়ের গন্ধওলা নতুন জাজিম, খয়েরি-কাজ-করা চিকনপাটি। এই ঘরেই বাসর হবে রাত্রে। তার বিয়ে। আমার বিয়ে। নায়রীরা আসছে একে-একে, আমাকে দেখে যাচ্ছে। অন্য মেয়েদের বিয়ে হয় বাপের বাড়িতে, ও-সব দান-সামগ্রীও মা-বাবাই দেন, কিন্তু আমার তো সবই উল্টো ব্যাপার, এটাই বা কেন ঠিকমতো হবে। আমার কোনো বাপের বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা কোথায় হারিয়ে গেলেন জানি না — পার্টিশনে ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে সব। আমার লজ্জা করছে — নানা কারণে। কিন্তু লজ্জা কেন — আমি তো আজ সম্মানিত, গৌরবান্বিত। আমি আজ একজন পরলোকগত সব-জজের পুত্রবধূ হ'তে চলেছি। আমার খুড়শ্বশুর একজন নামজাদা উকিল। বীডন স্ট্রিটের এই তেতলা বাড়ি, আমার দাদাশ্বশুরের তৈরি — এখানে আমরা থাকবো না অবশ্য, বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট নিয়েছে অবনী — কিন্তু এই বাড়ি আমারও তা তো মানতেই হবে। আহা, মা কেন বেঁচে নেই, বাবা কি সত্যি আছেন কোথাও, আবার তাঁকে

দেখতে পাবো কোনোদিন, না কি তাঁরও জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে, কোনো রেফিউজী ক্যাম্পে, কলেরায়? কিন্তু সেই আমার কান্নাভরা দিনগুলি, যখন মনে হ'তো আর কখনো ভোর হবে না, ফুটবে না আকাশে আলো — সব কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে আজ। আজ যেন নতুন ক'রে জন্ম হ'লো আমার। আজ থেকে আমি একজন বিবাহিতা স্ত্রী, ভদ্রমহিলা। অবনীর স্ত্রী, যে-অবনী আমাকে ভালোবাসে, যাকে আমি ভালোবাসি। এই দিনটি তোমার স্বপ্ন ছিলো, কমলা। জনতা-স্টোভে রান্না চাপিয়ে এই দিনটির কথা ভেবেছো। তুপুরবেলায় একলা ব'সে-ব'সে ভেবেছো। অবনীর পাশে শুয়ে, অন্ধকারে, তার চওড়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে — কতবার। এই দিন? এ-রকম একটি দিন? না — এ তোমার কল্পনাতেও ছিলো না। রেজিস্ট্রার ডেকে কাগজে দুটো সই বসালেই ব'র্তে যেতে তুমি। বা চলনসই শাঁখায় শাড়িতে, যেমন তোমার হয়েছিলো সেবারে, সেই প্রথম বার। তোমাদের মাদারিপুরে। তার বেশি সাধ্য ছিলো না তোমার বাবার, তার বেশি আশা তোমার ছিলো না। কিন্তু তাও টিকলো না — এমনি কপাল। তুমি কেঁদেছিলে, সেই অল্প-চেনা মানুষটির জন্য নয়, তোমার হারিয়ে-যাওয়া শাঁখা-সিঁদুরের জন্য, তোমার যে-সব সন্তান জন্মাতে পারলো না, তাদের জন্য। এবারেও, পুরোপুরি সধবার জীবন পেয়েও, তুমি ভুলতে পারোনি তোমার বিয়ে হয়নি, তুমি এখনো মা হ'তে পারছো না — কত তর্ক করেছো এই নিয়ে অবনীর সঙ্গে।

অবনী কোথায়? আছে এই বাড়িতেই, কিন্তু আজ সারাদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। রাত দশটায় লগ্ন, তাব আগে দেখা হবে না। আর তাও তো চোখের দেখা শুধু। সাত পাক ঘোরা, শুভদৃষ্টি, মন্ত্র-তন্ত্র, কড়ি খেলা, চাল খেলা — সোর ভাঙতে-ভাঙতে কোন না রাত দুটো বেজে যাবে। তা আমাদের আর তাড়া কিসের, আমরা তো পুরোনো। অনেকেই জানে সে-কথা, নায়রীরা সকলেই জানে, অনেকেই মুখ টিপে হাসছে। আমার এক কলেজে-পড়া মামাতো ননদ তো আমার সামনেই ব'লে গেলো, 'কী যে একটা ফার্স করছেন পিসিমা!' ফার্স — তামাশা, হাসি-ঠাট্টাব ব্যাপার। আর সত্যি তো তা-ই, তাছাড়া আর কী। প্রায় এক বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করার পরে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর 'মতো', আর স্বামী-স্ত্রী — এ-দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। 'মতো' হ'লে ইজ্জৎ থাকে না। কেউ-কেউ কানাঘুষো করে, আড়চোখে তাকায় — এই মস্ত বড়ো কলকাতাতেও, এই স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগেও। 'মতো' হ'লে সিঁদুর পরা যায় না। রাস্তায় বেরোলে বেল্লিকগুলো চোখ টেপে, পিছু নেয়। কিন্তু আজ আমার শাঁখা-সিঁদুর আমি ফিরে পাচ্ছি। আমার কথার ধরন বদলে যাবে, চলার ধরন বদলে যাবে, সকলের সঙ্গে ব্যবহার বদলে যাবে। আমাকে পেছন থেকে দেখেও সবাই বুঝবে আমি বিবাহিত, তেমন-তেমন বখা ছোড়াও মুখোমুখি পড়লে চোখ নামিয়ে নেবে। আমি তাই আমার শ্বশুরবাড়ির এঁদের সঙ্গে একমত। এ-সবের দরকার ছিলো —

চাল খেলা কড়ি খেলা, সব-কিছুর। আত্মীয়-কুটুম্বের মুখ বন্ধ করার জন্য। এই বিয়ে যে সত্যিকার বিয়ে, পুরোপুরি বিয়ে, কোথাও কোনো গলতি নেই, ফাঁকি নেই, সেইটে বোঝাবার জন্য। আমার সব খুঁত ঢেকে দেবার জন্য। সত্যি — এঁদের ছেলের তুলনায় আমি কী? বিধবা (এঁরা সেটা জানেন না যদিও), নিচ্ছন গরিব, পাশ-টাশ কিছু করিনি, জাতকুল-খোয়ানো ভিটেমাটি-ওপড়ানো রেফিউজী। যেন একটা ভূমিকম্প হ'য়ে গেলো হঠাৎ — দেখলাম আমি কলকাতায়, রাস্তায়, একা। তার ওপর, এই ন-মাস ধ'রে — না, পুরুষের পক্ষে কিছু না, কিন্তু মেয়েদের তো কলঙ্ক। আমাকে কেউ একটা 'রাখা মেয়ে' বললে কী জবাব ছিলো আমার? আজ আমার সব কলঙ্ক এঁরা মুছে দিচ্ছেন। যেমন, শুনেছি, আগেকার দিনে বিলেত-ফেরতা ছেলেকে গোরুর চনা খাইয়ে মাথা মুড়িয়ে শুদ্ধি ক'রে নেয়া হ'তো, তেমনি। আমাকে এঁরা ঘরে তুলছেন, জাতে তুলছেন — তারই জন্য সকাল থেকে শানাই, লোকজন, আয়োজন। এঁরা ছেলের মুখ চেয়ে আমাকেও মেনে নিলেন — যে-আমার এত খুঁত, এত কলঙ্ক। আমি এঁদের পায়ের ধুলো নিচ্ছি, আমি কৃতজ্ঞ।

— কিন্তু আমার কলঙ্ক যে কত, তা আমি ছাড়া আর কে জানে।

২

কমলার মনে পড়লো শান্তি-মাসির বাড়িতে তার দিনগুলি। টানাটানির সংসার, বাড়ি বলতে ছোট্ট দু-খানা ঘর আর এক চিলতে বারান্দা, ছেলেপুলের সংখ্যা পাঁচ — তাদেব বয়স আঠারো থেকে তিন। শেষেরটি হবার পর থেকে মাসি অম্বলে ভুগছেন, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, দেখতে বয়সের চাইতে বুড়ো হ'য়ে গেছেন। এর ওপর আবার একটা উটকো গলগ্রহ— আপদ আর কাকে বলে! তবু মাসি তাকে প্রথম দেখে আহা বাছা বলেছিলেন, দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন রাঙা-দির, অর্থাৎ কমলার মায়ের কথা বলতে-বলতে, নিজের দু-একখানা পুরোনো জামা-কাপড়ও দিয়েছিলেন তাকে। কৃতজ্ঞতায় গ'লে গিয়ে কমলা বলেছিলো, 'শান্তি-মাসি, আমি আপনার সব কাজ ক'রে দেবো, আমাকে এক কোণে একটু প'ড়ে থাকতে দিন।' ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত নিজেকে ব্যস্ত রাখে কমলা — রান্না, ঝাঁটপাট, ঘর গোছানো, কাপড় কাচা — কিছু বাদ দেয় না। তার ভালো লাগে এই খাটুনি, অন্য কিছু ভাবার সময় থাকে না, দুঃখ ভুলে থাকা যায়। এতে মাসিরও সুবিধে হচ্ছে সন্দেহ নেই, তাঁর শরীর ভালো না, লোক বলতে একটিমাত্র ঠিকে ঝি, আর ছেলেপুলে নিয়ে হাঙ্গামা তো কম নয়। মাসিকে মনে হয় খুশি, অথচ যেন খুশিও নন, মাঝে-মাঝে হঠাৎ তাঁর মুখ আঁধার হ'য়ে যায়, যেন কী-একটা কথা মনের মধ্যে গুমরোচ্ছে, কমলার বুক

দুরদুর করে পাছে এই আশ্রয়টুকু খ'সে পড়ে। একদিন কাচা কাপড়ের বালতি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েই মানিকের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো, মাসির বড়ো ছেলে, মানিক। তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো ছেলেটা, নিচু গলায় বললো, 'কমলা-দি, আমাকে বালতিটা দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' হঠাৎ মাসির গলা শোনা গেলো, 'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। তোর মা যে খেটে-খেটে কঙ্কালসার হ'লো, কখনো তাকিয়ে দেখিস? আর তোকেও বলি, কমলা, ও-রকম ভেজা গায়ে বেরিয়েছিস কেন লোকের সামনে? লাজলজ্জা নেই?' এই প্রথম সে রূঢ় কথা শুনলো মাসির মুখে, সেটাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু মাসি যেন দিনে-দিনে আরো বিগড়ে যাচ্ছেন, কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করেন এক-এক সময়। মেসো যদি কখনো বলেন, 'তা কমলা এসে পড়ায় ভালোই হ'লো, শান্তি, তুমি খানিকটা বিশ্রাম পাবে,' মাসি তক্ষুনি ঠোঁট বাঁকান — 'ওঃ, আমার জন্যে যে দরদ উথলে উঠছে হঠাৎ! তোমাদের বাঁদিগিরি ক'রেই জনম কাটলো, আমার আবার বিশ্রাম!' মেসো যদি বললেন, 'কমলা, দুটো পান সেজে আনো তো,' মাসির মন্তব্য — 'যা, যা, শিগগির পান সেজে আন, তুই না-সাজলে তোর মেসোর আবার রোচে না আজকাল।' কমলা মনে-মনে বুঝে নিলো ব্যাপারটা — সে যে দু-বেলা দু-মুঠো খায় সেজন্যে রাগ নয় মাসির, সে যে বুড়ো হয়নি, তার স্বাস্থ্যও ভালো, এটাই তার প্রধান অপরাধ মাসির চোখে। অথচ তাকে হুট ক'রে তাড়িয়ে দিতেও

পারছেন না তিনি, এমন বিনি-মাইনের চাকরানি আর পাবেন কোথায় ?

একদিন মেসো বললেন, 'তুমি কী ভাবছো, শান্তি ? কমলার কী ব্যবস্থা করা যায় ?' 'তোমার নিজের ব্যবস্থা কে ক'রে দেয় তারই ঠিক নেই, তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না।' তখন রাতের খাওয়া হচ্ছে, মেসো বসেছেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, মাসি পরিবেষণ করছেন, কমলা দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। মেসো এক গ্রাস ভাত খেয়ে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম কী, কমলার বিয়ে দিলে কেমন হয় ?' 'শোনো কথা — বিধবার আবার বিয়ে !' 'ও-সব কড়াক্কড় তেমন নেই তো আজকাল। আমাদের আপিশে, জানো —' মাসি বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো তো ! তোমার নিজের তিনটে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে সে-খেয়াল আছে ?' তার তো দেরি আছে এখনো। জানো, আমাদের আপিশে বিনোদ ব'লে একটি ছেলে নতুন ঢুকেছে — ভারি ভালো ছেলেটি, স্বাধীনচেতা, মনটা উদার — তার হয়তো বিধবাতে আপত্তি হবে না।' মাসি কমলার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওর কপালে যদি বিয়েই থাকবে তাহ'লে জ্বলজ্যান্ত সোয়ামিটা মরবে কেন ? ফাটা হাঁড়ি কি আর জোড়া লাগে !' মেসো এর পরেও বললেন, 'আমি বিনোদের কাছে কথাটা একটু তুলেওছিলাম — সে মেয়েটিকে দেখতে চায় একবার। আমি বলি কী, কমলা দেখতে ভালো তো, বিনোদের চোখে ধ'রে যেতে পারে।' 'শুনে রাখ, কমলা, এ-বাড়িতে এসে তুইও

সুন্দরী হলি! ধন্যি তোমাদের পুরুষমানুষের চোখ বাপু! বাব্বাঃ — খেতে পায় না, তবু গতরখানা কী হুরমুশে! গেরস্ত ঘরের মেয়ে ব'লে মনে হয় না। তা তোমাদের তো ঐ হ'লেই হ'লো — মুখের ছিরি-ছাঁদ দিয়ে দরকার কী?' মেসো আর মানিক একসঙ্গে মুখ তুললো খাওয়া থেকে, দু-জনেই চকিতে একবার কমলার দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিলো। মেসো নিঃশব্দে খাওয়া শেষ ক'রে উঠে গেলেন।

তবু হয়তো কমলা আরো কিছুদিন কাটাতে পারতো মাসির বাড়িতে, হয়তো মেসো চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঐ বিনোদের বা অন্য কারো সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিতেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ কমলার জীবনটাকে আর-একবার উল্টে-পাল্টে দিলো অম্বু।

একদিন — বেলা সাড়ে-দশটা তখন — মেসো আপিসে বেরিয়ে গেছেন, সকালের পাট চুকে যাবার পর ক্লান্ত হ'য়ে একটু শুয়েছেন মাসি, তাঁর মেয়ে তিনটি স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ বাণী চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, দ্যাখো, কে এসেছে দ্যাখো!' ফিরে তাকানোমাত্র হাসি ফুটলো মাসির মুখে, উঠে বসতে-বসতে বললেন, 'ও মা, অম্বু! এসো, এসো — তোমার যে আর দেখাই নেই, ব্যাপার কী?' 'আর বলবেন না, মাসিমা, যা ব্যস্ত থাকি!' ব'লে একটি জোয়ান চেহারার যুবক ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো। মাসির অন্য দুই মেয়ে ছুটে এলো সাড়া পেয়ে, তিন বোন একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠলো। একজন বললো, 'অম্বু-দা,

এবারে আমাদের সরস্বতী পুজো কেমন হবে, বলো। ডোভাব লেনের চাইতে সুন্দর প্রতিমা হবে তো?' আর-একজন বললো, 'আমি কিন্তু এবারে একটা গান গাইবো — কেমন, অম্বু-দা?' আর ছোটোটি আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে বললো, 'আমি ফুল চুরি করবো শেষরাত্রে উঠে — কী মজা!' মাসি ব'লে উঠলেন, 'আঃ, তোরা এত জ্বালাসনে তো অম্বুকে, বসতে একটা চেয়ার দে। তারপর, অম্বু — কী খবর-টবর, বলো।' বাণী আবার কথা বললো, 'সরস্বতী পুজোর তো দেরি আছে এখনো, তার আগেই একটা ফাঙ্কশন করো না, অম্বু-দা।' 'আধুনিক গান!' 'কমিক!' 'ক্যারিকেচার!' 'তোরা কি গল্প ক'রেই বেলা কাটিয়ে দিবি — স্কুলে যেতে হবে না?' 'যাচ্ছি তো,' গলা ভার শোনালো বাণীর; তিন বোন আরো কয়েকবার আয়নায় মুখ দেখে বইখাতা নিয়ে বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেলো। ছোটো বাচ্চাটি মেঝেতে ছুটোছুটি করছিলো এতক্ষণ, মাসি হঠাৎ তাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন, চুমো খেলেন। 'কমলা, এখন একবার ঘুম পাড়িয়ে দে না খোকাকে, দস্যিপনা ক'রে-ক'রে রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।' কমলা পাশের ঘরে চ'লে এলো বাচ্চাটিকে নিয়ে, খানিক পরে মাসি আবার হাঁক দিলেন, 'কমলা, এক পেয়ালা চা দিয়ে যা তো এখানে।' চায়ের পেয়ালা নিয়ে দরজার ধারে একটু থমকালো কমলা; মাসি শুয়ে আছেন আর অম্বু পাশে ব'সে মুখ নিচু ক'রে তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছে। মাসি খুব সহজ গলায় বললেন, 'আর দরকার নেই, অম্বু। এবার চা খাও।'

উঃ, আমার এই মাথা-ধরা আর রেহাই দেবে না আমাকে'। চা-টা এখানে রাখ, কমলা।' অম্বু উঠে এসে চেয়ারে ব'সে হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিলো; কমলার মনে হ'লো ঐটুকু সময়ের মধ্যে তাকে এক ঝলকে দেখে নিলো সে, যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেলো। বেরিয়ে আসতে-আসতে একটা কথা তার কানে এলো, 'মাসিমা, এই মেয়েটি কে?' উত্তরে মাসি নিচু গলায় কী বললেন বোঝা গেলো না।

হঠাৎ সময়ে-অসময়ে চ'লে আসে অম্বু, তার সাড়া পেলে মাসির হাতের কাজ থেমে যায়, সে যতক্ষণ থাকে অন্য দিকে মন দেন না। আজে-বাজে গল্প করে সে, মাসি হাঁ ক'রে গেলেন সে-সব; 'আজকালকার' মেয়েদের নিন্দের কোনো গন্ধ পেলে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সায় দেন। সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের অমুক-বাবুর স্ত্রী, স্বামী ট্যুরে গেলে, দেওরের সঙ্গে কী-রকম লীলাখেলা চালান; কোন ষোলো বছরের ছেলের বালিশের তলায় তার মামাতো বোনের বডিস পাওয়া গেছে; কোন মেয়েদের হস্টেল খানাতল্লাশি ক'রে একগাদা বাচ্চা না-হবার ওষুধ পেয়েছে পুলিশ—এ-সব শুনতে-শুনতে মাসির মুখ জলজ্বল ক'রে ওঠে, লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'বলো তো, অম্বু, এ-রকম হ'লে আর জাতধর্ম রইলো কোথায়?' 'যা বলেছেন, মাসিমা! জানেন, একটা নভেল বেরিয়েছে, তাতে যা আছে না—ছী-ছি-ছি, ও কি মা-বোনের হাতে দেয়া যায়; না কি শ্বশুরই প'ড়ে শোনাতে পারে ছেলের বৌকে!

জঘন্য!' 'তা-ই নাকি? সত্যি?' ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে মাসি বলেন, 'আমাকে একবার পড়াতে পারো বইটা?' অম্বু গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'আমাকে মাপ করবেন, মাসিমা, আমি এ-বাড়িতে ও-রকম বই আনতে চাই না। মানিক্-বাণীরা আছে তো।' 'আহা — সে-খেয়াল যেন আমারই নেই! আমি লুকিয়ে রাখবো, ওরা কেউ জানতেই পাবে না। আমার ছেলেমেয়েদের আমি কী-ভাবে মানুষ করছি, দেখছো তো। আমার কথায় ওঠে, আমার কথায় বসে।' 'তা-ই তো।' হঠাৎ একটু অদ্ভুত ধরনে হেসে ওঠে অম্বু।

অম্বুর ধরন-ধারন থেকে মনে হয় সে যাকে বলে করিৎকর্মা ছেলে, আর বাণীরা যা বলাবলি করে তা থেকেও বোঝা যায় এই গর্চা-লেন পাড়ার পাণ্ডা বলতে অম্বুকেই বোঝায়। দরকার হ'লে রাত-বিরেতে ডাক্তার ডেকে আনা, কোনো বাড়িতে চুরি হ'লে থানা-পুলিশ, বিয়ে হ'লে দলবল জুটিয়ে খাটা-খাটনি, অম্বু থাকতে এ-সবের জন্য নাকি ভাবতে হয় না। খোলা বাজারে যা পাওয়া শক্ত — কোনো ওষুধ বা শিশুর পথ্য বা রোগীর জন্য বেগুনবিচি চাল — তাও জোগাড় হ'য়ে যায় অম্বুকে বললে। একবার বেপাড়ার এক ছোকরা নাকি উনিশ নম্বর বাড়ির মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছিলো — অম্বু এক থাপ্পড়ে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলো তার। পাড়ার ক্লাব তারই জন্য জমজমাট, পুজোর সময় চাঁদা তোলা থেকে লরিতে ক'রে বিসর্জন পর্যন্ত সব তার হাতে। এ-সব শুনে, আর মাসির

হাবভাব দেখেও, কমলা বুঝে নিয়েছিলো যে তাকে বেশ সাবধান থাকতে হবে অম্বুর বিষয়ে, কিন্তু ঐটুকু বাড়িতে আড়ালে থাকার উপায় নেই, কমলা প্রায়ই সামনাসামনি প'ড়ে যায়; বোঝে, তার চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করছে অম্বু, কোনো-কোনো কথা মাসিকে কাটিয়ে তাকেই বলতে চাচ্ছে; আলগোছে সেখান থেকে স'রে যায় কমলা। সেদিন রোববার, অম্বু দুপুরবেলা এসে বললো, ' "রজনীগন্ধা" দেখতে যাবেন আজ? আমি কয়েকটা পাশ পেয়েছি।' মাসি চোখ বড়ো ক'রে বললেন, 'ও মা, তুমি সিনেমাতেও পাশ পাও! আগে তো কখনো বলোনি।' ' "রজনীগন্ধা!" উত্তম-সুচিত্রা! কিশোরকুমার!' হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েরা — 'চল চল এক্ষুনি খেয়ে-টেয়ে নিয়ে তৈরি হই।' মাসি একগাল হেসে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে অম্বু, মাসির জন্যে পাশ নিয়ে এসেছে! তাহ'লে আমরা আজ দোতলায় বসবো — অ্যাঁ?' 'দোতলায় বইকি। তা — আপনার বোন-ঝি — উনিও যাবেন তো?' 'কমলার কথা বলছো?' মাসির গলা গম্ভীর শোনালো, 'অত-গুলো পাশ কি দিতে চাইবে ওরা?' 'তার জন্যে আটকাবে না।' 'না, না, কমলা কী ক'রে যাবে — ওর কত কাজ!' একটু চুপ ক'রে থেকে অম্বু বললো, 'আচ্ছা, আপনারা তাহ'লে তিনটের একটু আগে পৌঁছবেন, আমি "বিজলী"তে থাকবো।' অম্বু চ'লে যাওয়ামাত্র স্নান-খাওয়ার হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেলো বাড়িতে, তারপর সাজগোজের পালা, মাসি একটা সিল্কের শাড়ি পরলেন, পাৎলা চুলে খোঁপা বেঁধে মুখে

পাউডার বুলোলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা হ'য়ে গেলো।

মেসো ঘুমোচ্ছেন, মানিক সারাদিনের মতো আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে, জগার মা বাসন ধুয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলো। সারা পাড়া চুপচাপ, এ-বাড়িতেও সোরগোল নেই। এই প্রথম এ-বাড়িতে একা হ'লো কমলা, কেমন একটু ভালো লাগলো তার। এখনো তার হাতের কাজ ফুরোয়নি, রান্নাঘর ধুয়ে রাখতে হবে — মাসি আবার ধোয়া-মোছার ব্যাপারে পিটপিটে, আর জগার মা-ও কাজে বড্ড ফাঁকি দিচ্ছে আজকাল। কেনই বা দেবে না ; জানে তো, সে না-করলেও কোনো কাজ প'ড়ে থাকবে না। কমলা রান্নাঘরে এসে ঝাঁটা হাতে নিলো, হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। রান্নাঘরের পেছনে সরু গলিতে সারি-সারি কাপড় ঝুলছে তারে, তার ওপর আড় হ'য়ে রোদ্দুর পড়েছে। মনে পড়লো মাদারিপুরের বাড়ি, উঠোনে জামগাছের ছায়া, ডালে-পাতায় হাওয়ার শব্দ মাঝে-মাঝে। নিশ্বাস পড়লো কমলার। একটা হলদে রঙের কুকুর ছিলো না, প'ড়ে থাকতো সব সময়, তাকে দেখলেই তিরতির ক'রে ল্যাজ নাড়তো? স্বপ্ন — সব স্বপ্ন হ'য়ে গেছে। কমলার হঠাৎ মনে হ'লো সে যেন পর-পর অনেকগুলো আলাদা-আলাদা মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে : প্রথমে মা-বাবার মেয়ে, তারপর নিতাই ভটচাযের বৌ, তারপর রেফিউজী ক্যাম্পের জঞ্জাল, তারপর এই শান্তি-মাসির বাড়িতে — তারপর — তারপর কী? আরো কিছু আছে কি তার ভাগ্যে,

না কি এখানেই শেষ? মুহূর্তের জন্য যেন আলস্য নেমে এলো কমলার শরীরে, তক্ষুনি গা-ঝাড়া দিয়ে রান্নাঘর ধুয়ে ফেললো, বাসনগুলো গুছিয়ে রাখলো তাকে, তারপর তোয়ালে কাঁধে নিয়ে স্নান করতে চলেছে, এমন সময় টুনটুন শব্দ হ'লো বাইরে। কেউ কড়া নাড়ছে? এই অসময়ে কে? আবার শব্দ, এবার একটু জোরে। জগার মা ফিরে এলো নাকি কোনো দরকারে? কমলা দরজা খুলে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পেছিয়ে এলো কয়েক পা। অম্বু ঘরে ঢুকে বললো, 'আমাকে দেখে ভয় পেলেন নাকি?' 'না, না — কিন্তু আপনি হঠাৎ এ-সময়ে? সিনেমায় যাননি? অন্যেরা কোথায়?' 'আমি ওঁদের সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে এলাম। আমি আপনার কাছেই এসেছি,' ব'লে অম্বু একটা চেয়ার টেনে বসলো। এবারে সত্যি একটু ভয় পেলো কমলা, অথচ সেই ভয়ে যেন সুখেরও কিছুটা অংশ আছে, একটা না-জানা প্রতিযোগিতায় হঠাৎ যেন সে জিতে গেলো। তার কি চ'লে যাওয়া উচিত এখান থেকে? মেসোকে ডেকে তোলা উচিত? কিন্তু কেন — অম্বু এ-বাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করে, শুধু তার সঙ্গে কথা বললেই দোষ? কমলার হঠাৎ খেয়াল হ'লো তার পরনের শাড়িটা বড্ড ময়লা, চুল খোলা, কাঁধে একটা তোয়ালে ঝুলছে; তোয়ালেটা হাতে নিয়ে মুখ মুছে বললো, 'আমি — স্নান করতে যাচ্ছিলাম।' 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমার একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে, দু-মিনিট সময় দেবেন?' 'আমার সঙ্গে আপনার দরকার?'

'দরকারটা হয়তো আপনারই আসলে, শুনলে বুঝবেন।' তারপর, কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে অম্বু বললো, 'আপনি সিনেমায় নামতে চান?' 'সে কী!' কমলা আকাশ থেকে পড়লো কথা শুনে, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেললো, 'এমন একটা অসম্ভব কথা আপনি ভাবলেন কী ক'রে?' 'সম্ভব না অসম্ভব তা পরে দেখা যাবে, আপনি রাজি কিনা তা-ই বলুন।' চোখ সরু ক'রে অম্বু তাকালো তার দিকে, অস্বস্তি হ'লো কমলার। 'না।' 'না কেন?' 'কী আশ্চর্য — আমি— আমি কী ক'রে — আমাকে কেউ নেবেই বা কেন?' 'সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন না।' 'আমাকে মাপ করবেন, আমি পারবো না ও-সব।' 'আপনার কথা আমি কিছু-কিছু শুনেছি শান্তি-মাসির কাছে,' নিচু গলায় বলতে লাগলো অম্বু, 'আর এ-বাড়িতে আপনার দিন কী-ভাবে কাটছে তা তো চোখেই দেখি যখনই আসি। এই তো, সাড়ে-তিনটে বাজতে চললো, এখনো আপনার স্নান-খাওয়া হয়নি। একে কি একটা জীবন বলে! আপনার ইচ্ছে করে না এ থেকে বেরিয়ে আসতে?' কমলার মনটাকে কোথায় যেন ছুঁয়ে গেলো এই কথাগুলো, একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার উপায় নেই।' 'শান্তি-মাসির জন্য ভয় পাচ্ছেন?' অম্বুর ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গেলো হাসিতে। 'আমি ওঁকে সামলাতে পারবো — ভাববেন না। তাহ'লে — রাজি?' 'আমাকে একটু ভাবার সময় দিন।' 'এ নিয়ে আর ভাবার কী আছে। কথাটা হচ্ছে, ফিল্মের লাইনে কিছু চেনা-

শোনা আছে আমার, চেষ্টা করলে কিছু হ'য়ে যেতে পারে, এই আরকি। ··· চলি এখন, কাল আবার আসবো।'

৩

অম্বু চ'লে যাওয়ার পর কমলার মনে হ'লো তার মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে। এ কি সত্যি, এ কি সম্ভব — সে সিনেমায় নামবে, সে, কমলা? অম্বু কি ধাপ্পা দিয়ে গেলো আমাকে, একটা বাত-কে-বাত ব'লে গেলো? আমি তো সত্যি বলতে তাকে চিনিও না — সে কী, কেমন, পাড়ার সর্দারি ছাড়া আর কী করে বা কিছু করে কিনা, কিছুই জানি না আমি। বিশ্বাস কী তার কথায়? বাজে — ও-সব ভুলে যাওয়াই ভালো, ও-সবের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু কেন হঠাৎ ও-রকম একটা ফালতু কথা আমাকে বলতে যাবে অম্বু, তাতে তারই বা লাভ কী? সত্যি কি কিছু আছে এর পেছনে? এই ফিল্মের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি — কত হাভাতে মেয়ের কপাল খুলে গেছে দেশে-বিদেশে, যার পেট চলতো না সে নাকি রাজার ধনের মালিক হয়েছে। কিন্তু ক-টা হয় ও-রকম? লাখে একটা — কোটিতে একটা? কিন্তু — কোনোমতে বেঁচে থাকার সংস্থানটুকু কি হ'তে পারে না আমার? খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেবে, অন্ধকারে গলার কাঁটা হ'তে হবে না — এইটুকু? 'একে কি

একটা। জীবন বলে! এ থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না আপনার?' সত্যি — আমিও তো মানুষ, আমাকে চিরকাল কেন পায়ের তলার কাদা হ'য়ে থাকতে হবে? 'আমার উপায় নেই।' কিন্তু আছে হয়তো, আমি জানি না, খুঁজে দেখিনি, খুঁজতে শিখিনি। কী জানি আমি — এই মস্ত বড়ো জগতের, মস্ত বড়ো কলকাতা শহরের কতটুকু খবর রাখি? সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বাণীরা তিন বোন পরস্পরের গলা ডুবিয়ে সত্ত-দেখা ফিল্মটার কথা বলতে লাগলো — ভাবটা এমন যেন ওখানে যারা নায়ক-নায়িকা সাজে তাদের মতো আশ্চর্য মানুষ আর ধরাধামে নেই। শুধু টাকা নয়, ঘরে-ঘরে এই ডামাডোল। তাহ'লে — চেষ্টা করবো? পাগল — আমি একটা কী? আমার না আছে রূপ, না কোনো গুণযোগ্যতা। কিন্তু যদি কিছুই না-থাকবে, তাহ'লে অম্বু বলবে কেন হঠাৎ? এটা তো ঠিক সে আমার উপকার করতে চাচ্ছে, কেন আমি তাকে এক কথায় ফিরিয়ে দেবো? মনের মধ্যে এমনি তোলাপড়া চলতে লাগলো আমার — কখনো জোনাকির মতো আশার ঝিলিক, আবার কখনো একটা আবছা ভয় — অজানা পথে পা বাড়িয়ে কোনো বিপদে পড়বো না তো?

পরদিন দুপুরবেলা মাসির ঘরে আমার ডাক পড়লো; গিয়ে দেখি অম্বু ব'সে আছে। মাসি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কমলা, অম্বু কী বলছে শোন।' অতি বিনীত আর নরম সুরে অম্বু বললো, 'যদি অভয় দেন রাগ করবেন না তাহ'লে বলি।'

'আহা, যার চালচুলো নেই তার আবার রাগরঙ্গ! শোন —' এর পরে মাসিই তুলে নিলেন কথাটা, আমি বুঝলাম অম্বু তাঁকে যা জপিয়েছে তা-ই তিনি শোনাচ্ছেন আমাকে — 'তোর জন্য খুব একটা ভালো কাজ জোগাড় করেছে অম্বু।' 'খুব ভালো কিনা জানি না, ঠিক জোগাড়ও এখনো হয়নি, তবে আপনাদের আপত্তি না-থাকলে —' 'সিনেমার কাজ,' অম্বুর কথা কেড়ে নিয়ে মাসি আবার বলতে লাগলেন। 'আজকাল ওতে কারা পার্ট করছে জানিস তো? সব ভদ্রঘরের মেয়ে, বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়ে। টাকা পায় অনে-ক —' মাসির চোখ দুটি চকচক ক'রে উঠলো — 'কেউ-কেউ হাজার-হাজার টাকাও ঘরে আনে!' 'হাজার কেন, লক্ষও পায় অনেকে, কিন্তু সকলের কি আর তা হয়, মাসিমা? তা ছোটোখাটো পার্টের জন্যও লোক দরকার হয়, আমি সেই ধরনের কিছু ভাবছিলুম', ব'লে অম্বু আমার দিকে এক পলক তাকালো। 'তা টাকা দেবে তো ওতেও?' 'অল্প-স্বল্প দেবে, ধরুন মাসে চার-পাঁচশোমতো হ'তে পারে।' 'কী যে বলো, অম্বু, পাঁচশো কি অল্প হ'লো? বলতে নেই, কমলা —' আমার দিকে তাকিয়ে অকারণে গলা নিচু করলেন শান্তি-মাসি, 'তোর মেসোর কথাই ধর না, বি. এ. পাশ, একটা আপিশের বড়োবাবু, তাও তো দ্যাখ মাসের শেষে যা ঘরে আনে তাতে এদিক টানতে গেলে ওদিক ফেঁশে যায়। তা তোর নিজের আর খরচ কী, বল, আছিস তো আমাদের কাছেই, আর আমরা ছাড়া আপনজন বলতে কে বা আছে তোর। শোন, এখনই ব'লে

রাখছি, টাকা নিয়ে ছানভান করিস না, হাতে পেয়েই আমাকে এনে দিস, আমি বুঝে-সুঝে বিলিব্যবস্থা করবো।' মাসি মিষ্টি ক'রে হাসলেন একটু, তারপর অম্বুর দিকে ফিরে বললেন, 'তাহ'লে, অম্বু, তুমি কাল সকালে এসে ওকে নিয়ে যেয়ো।' এতক্ষণে একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু আমি কি পারবো?' 'আহা, হাত-মুখ নেড়ে ছুটো কথা বলা — তা আবার কে না পারে।' 'তা তো ঠিকই!' হঠাৎ বেখাপ্পারকম শব্দ ক'রে হেসে উঠলো অম্বু, তার চোখ থেকে একটা দৃষ্টি ছুটে এলো আমার দিকে। আমি আবার বললাম, 'আমি পারবো না, শান্তি-মাসি।' 'কথা শোনো মেয়ের! রাজরানী হ'য়ে জন্মেছেন কিনা, পারবেন না! তোকে জন্ম ভ'রে খাওয়াবে কে, শুনি?' অম্বু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'থাক মাসিমা, আপনি জোর করবেন না মিছিমিছি। আমি বরং চলি।' মাসির চোখে রাগের ফুলকি জ্ব'লে উঠতে দেখলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বুঝছো না, ন্যাকামি হচ্ছে — একেই বলে পেটে খিদে মুখে লাজ। কমলা অত বোকা মেয়ে নয় যে সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে। তুমি কাল এসো, অম্বু।' অম্বু উঠলো, মাসি তার সঙ্গে বেরোতে-বেরোতে বললেন, 'দেখো, আবার যেন বদনাম-টদনাম না হয়। আমাকে তিন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বোঝো তো।' অম্বুর উত্তর আমার কানে এলো, 'আমি থাকতে ও-সবের জন্য ভাববেন না।'

খবর শুনে মানিক-বাণীদের মধ্যে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো, কিন্তু মেসো গম্ভীর হলেন। 'এটা কি ভালো হবে? বরং

বিয়ের চেষ্টাই করা যাক না।' 'ঐ এক কথা তোমার মুখে। বিয়ে মানে তো বাচ্চা বিয়োনো আর হাঁড়ি ঠেলা — আর এতে কত টাকা জানো?' 'ভাবছিলাম — লোকেরা কত কী বলে তো — শেষটায় আবার একটা থেকে আর-একটা না হয়।' 'ছোঃ! ও-সব বাজে কথায় আবার কান পাতে নাকি কেউ! তাছাড়া তোমার নিজের মেয়েকে তো দিচ্ছো না — অত ভাবনা কিসের? শোন, কমলা,' মাসি আমাকে দুটো উপদেশ দেয়া কর্তব্য মনে করলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলিস, ও-রকম একটা আওতায় প'ড়ে আবার বিগড়ে যাসনে। আর — ঐ যা বললাম, টাকা-পয়সা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার!' 'কমলা, তোমার নিজের কী ইচ্ছে?' ব'লে মেসো আমার দিকে তাকালেন। মাসি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ওর আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কী? আমরা ওর অভিভাবক, আমরা যা ঠিক ক'রে দেবো তা-ই হবে।' মেসো আরো দু-একবার প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু মাসি তখন টাকার স্বপ্নে বিভোর, কোনো যুক্তিতর্ক কানেই তুললেন না। পরদিন সকালে মাসি তাঁর একখানা জামদানি বের ক'রে দিলেন আমাকে, সেইটে প'রে অম্বুর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলাম। সেই রাস্তা আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছিয়ে দেবে তা তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

৪

এর পরের দিনগুলি ঠিক যেন মনে আনতে পারলো না কমলা, কেমন ঝাপসা হ'য়ে গেছে। এই যে সে নতুন বৌ সেজে ব'সে আছে, বীডন স্ট্রিটের এই তেতলার ঘরে, হাসছে মিষ্টি ক'রে, কথা বলছে অতি মৃদু গলায়, আর এই যে ভোজবাজির মতো গজিয়ে উঠছে লতায়-পাতায় কত নতুন আত্মীয় — এর সঙ্গে কেমন ক'রে মেলানো যায় সেই অস্থির দিনগুলিকে, যখন সে নিজে না-বুঝে এক কূল ছেড়ে এসেছে কিন্তু অন্য কূলও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না? প্রথমে কি অবাক লেগেছিলো তার — এটা কোন জায়গা, সে কেন এসেছে এখানে, ঠাউরে উঠতে পারেনি? কিন্তু দু-দিনেই কেমন অভ্যেস হ'য়ে গেলো — এমনকি তার ভালোই লাগলো এই নতুন আবহাওয়া। আশায়-ধুকপুক-বুক আরো কত মেয়ে, অনেকবার 'কিছু হবে না' শোনার পরেও আবার যারা ফিরে আসে — সেও আজ তাদেরই একজন। ছেলেরা যেমন চাকরির জন্যে দোরে-দোরে ঘোরে, তেমনি। কত নতুন মুখ, নতুন মানুষ, নতুন কথা, কত ঝকঝকে গাড়ি, ঝকঝকে শাড়ি, কত হাসি, কত ক্লান্তি, কত হতাশা। এটা বাইরের জগৎ, চোখ তুলে তাকালে আকাশ পর্যন্ত দেখা যায়, গায়ে লাগে হাওয়া ধুলো রোদ্দুর — হোক না সে অতি দরিদ্র, তবু সে আলাদা একটা মানুষ এখানে, শাড়িতে জড়ানো জীবন্ত বস্তা নয়। অবশ্য ওখানে পা দেয়ামাত্র চিচিংফাঁক হ'লো না, কিন্তু অম্বু অনবরত আশা দিয়ে যাচ্ছে,

মাসি টাকার জন্য হাঁ ক'রে আছেন, আর সকালে উঠে তারও মনে হচ্ছে মাসির খেজমৎ খাটার চাইতে বাইরে ঘুরে আসা ভালো। অবশেষে একটা ভিড়ের দৃশ্যে দাঁড়াতে পেলো সে, তারপর দৈবাৎ একটা আধ মিনিটের পার্ট জুটে গেলো. কিছুদিন পর আরো একটা। নিজের হাত-খরচের জন্য অল্প কিছু রেখে সে সব টাকাই মাসির হাতে দিলো, মাসির মুখে হাসি আর ধরে না, তাঁর মেয়েদের নতুন জামা-কাপড়ের সঙ্গে তাকেও একখানা মাঝারিগোছের শাড়ি কিনে নিলেন। কমলার মনে হ'লো তার দুখনিশি ভোর হ'লো বুঝি, হয়তো কোনো-একদিন সে স্বাধীনভাবে আলাদাও থাকতে পারবে, কিন্তু এমন সময় ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো যা তার ঠিক হিশেবের মধ্যে ছিলো না।

বোকা ছিলাম তখনও, বুঝতে পারিনি অম্বু কেন এগিয়ে এসে আমার উপকার করছে। বোকা — না কি ন্যাকা সেজেছিলাম? আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হচ্ছে অম্বুর — হঠাৎ সে স্টুডিওতে চ'লে আসে এক-একদিন, হয়তো বা আমারই জন্য তদ্‌বির করতে, মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা আমাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়। প্রথম দিন বলেছিলো, 'আমি শহরের দিকে যাচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি, কি?' 'না, না, আপনি কেন অসুবিধে করবেন, আমি বাস্‌-এই যেতে পারবো।' 'কিচ্ছু অসুবিধে নেই — ট্যাক্সিতে জায়গা আছে প্রচুর, আর আপনাকে নিলে ভাড়াও বেশি লাগছে না।' আমি সংকোচ কাটিয়ে উঠে বসলাম তার পাশে, যেতে-যেতে

বেশ খোলামেলাভাবে গল্প করতে লাগলো অম্বু, যেন আমার অনেকদিনের চেনা। 'ও। · · · তা হবে। · · · তা-ই নাকি?' আমার মুখে এর বেশি কথা জোগালো না, আমাকে নামিয়ে দেবার সময় অম্বু বললো, 'উহুঁ, অমন লাজুক হ'লে চলবে না তো, ফিল্মে আরো চটপটে মেয়ে চাই।' তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ফেরার ইচ্ছেটা আরো ক'মে এলো আমার, কিন্তু সরাসরি 'না' বলতেও পারি না, পাছে সে কিছু মনে করে — আর তার খুব স্পষ্ট কোনো দোষও আমি খুঁজে পাচ্ছি না তখনও। আমাকে সে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে — তা বলুক, এতে তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আমার। তার কথাবার্তা আমার মনে হয় একটু বোকার মতো — এই যেমন সে প্রায়ই আমাকে অভিনেত্রীদের ঐশ্বর্যের গল্প শোনায় — কে দেড় লক্ষ টাকা ইনকামট্যাক্স দিয়েছে, কার পুরো বাড়িটা এয়ার-কণ্ডিশণ্ড, আর কে-ই বা তাল-তাল সোনা কিনে লুকিয়ে রেখেছে বাথরুমের দেয়ালের মধ্যে — এ-সব কথার বুড়বুড়ি ফোটে তার মুখে। 'ইনকাম-ট্যাক্স' কাকে বলে, 'এয়ার-কণ্ডিশণ্ড' ব্যাপারটা বা কী, তা আমি ছু-দিন আগেও জানতাম না, আমার কাছে এ-সবের কোনো অর্থ নেই তাও কি বোঝে না অম্বু? আমার হাসি পায়, যখন সে বলে যে আমিও একদিন 'স্টার' হ'য়ে যেতে পারি, আমার 'ফিগার' নাকি চমৎকার, আমার চোখে নাকি খুব 'অ্যাপীল' আছে। হাসি পায়, কিন্তু কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি না, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'কী যে বলেন!' 'বাঃ, সুন্দর দেখায় তো তোমাকে লজ্জা পেলে।'

মাঝে-মাঝে অম্বু এমনভাবে তাকায়, বা হাসে, বা এমন সুরে কথা বলে, বা এমন কোনো-কোনো বিষয় টেনে আনে, যাতে আমি কুঁকড়ে যাই ভেতরে-ভেতরে, আর এও আমার অবাক লাগে যে আমাকে সে বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছিয়ে দেয় না কখনো, গলির মোড়ে নামিয়ে দেয়। আমি যদি ভদ্রতা ক'রে বলি, 'একটু আসবেন নাকি আমাদের ওখানে?' সে জবাব দেয়, 'নাঃ, শান্তি-মাসির ভ্যানভ্যানানি আর ভালো লাগে না। বড্ড গোলমেলে মানুষ।' শান্তি-মাসিকে আমি মনে-মনে যা-ই ভাবি না, অম্বুর মুখে এ-ধরনের কথা আমার কানে অভদ্র ঠেকে, মাসির কথা উঠলে সে সারা মুখে ভাঁজ ফেলে যে-ভাবে হাসে, সেটা সত্যি বলতে কুৎসিত লাগে আমার। কিন্তু আমি চেষ্টা করি তাকে খারাপ ব'লে না-ভাবতে, কিংবা ভাবি ভালো-মন্দ বিষয়ে আমার ধারণাগুলি বড্ড পুরোনো, পাড়াগেঁয়ে, আমার বোধহয় কলকাতার চাল-চলন শিখে নেয়া উচিত।

সেদিন বেশ শীত ছিলো, ট্যাক্সিতে উঠে অম্বু বললো, 'তুমি কোনো গায়ের কাপড় আনোনি, দেখছি — আমারটা নাও।' আমি ত্রস্তে ব'লে উঠলাম, 'না, না, কোনো দরকার নেই — আমার শীত করছে না।' অম্বু তার ভাঁজ-করা আলোয়ানটা ছড়িয়ে দিলো আমার পিঠের ওপর, আমি আবার বললাম, 'সত্যি আমার দরকার নেই।' 'কী আশ্চর্য — আমাকে না-হয় তোমার পছন্দ হয় না, কিন্তু আলোয়ানটা দোষ করলো কী?' আমার তর্ক করতে ইচ্ছে করলো না, তাছাড়া মনে হ'লো

বোধহয় একটা ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি, কোণ ঘেঁষে ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। একটু পরে অম্বু বললো, 'রাগ করলে? আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না?' যেন তার এই ঘনিষ্ঠ হবার ভাবটা লক্ষ করিনি, এমনি সুরে বললাম, 'কিছু বললেন?' 'ব'লে আর কী হবে — আমার কোনো কথাই তো রাখলে না এ-পর্যন্ত। একটা ফিল্মে নিয়ে যেতে চাইলাম — "না"! চিড়িয়াখানা — ডায়মণ্ড হার্বরে পিকনিক — "না"! মাঝে-মাঝে "হ্যাঁ" বলতে হয়, জানো তো। যেমন ধরো, এই যে তুমি ফিল্মে কাজ করছো — এটা ভালো হয়নি?' আমি হঠাৎ বললাম, 'আমি যা করছি তাকে কি আর কাজ বলে! এ তো এক ধরনের উঞ্ছবৃত্তি।' অম্বু যেন খুব খুশি হ'লো আমার কথা শুনে, টেনে-টেনে বললো, 'সবুর করো, কমলা, সবুর করো, এক লাফে তো মগডালে ওঠা যায় না।' একটু পরে আবার বললো, 'একটা খবর আছে, কমলা। শুনবে নাকি?' 'বলুন।' 'আরে একটু তাকাও না আমার দিকে। অমন জবুথবু হ'য়ে ব'সে আছো কেন? শোনো, আমার এক বন্ধু সিনেমার ব্যাবসায় নামছে, তার প্রথম ফিল্মের হীরোয়িন হবার জন্য নতুন মেয়ে চাই,' ব'লে অম্বু চুপ করলো। আমার বুকের মধ্যে আশার কাঁপুনি অনুভব করলাম, মুখে কিছু বললাম না। 'আমি তোমার কথা তাকে বলেছি, জানো। সে একবার দেখতে চায় তোমাকে। তোমার আপত্তি নেই তো?' 'আপত্তি কেন থাকবে?' 'তাহ'লে চলো না কাল আসানসোলে আমার সঙ্গে।'

'আসানসোলে কেন?' 'আমার বন্ধু সেখানেই থাকে, একটা কয়লা-খনির ম্যানেজার সে।' 'তিনি কলকাতায় আসেন না কখনো?' 'সামনের মাসে আসবে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে ফেলতে। দেরি করলে ফসকে যেতে পারে, বোঝো তো।' আমি তখন স্বাধীন উপার্জনের স্বাদ পেয়েছি, স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখি মাঝে-মাঝে, তাই অম্বুর কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। অজান্তে আমার মনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'কিন্তু আসানসোলে কী ক'রে যাই?' 'ট্রেনে যাবে, ট্রেনে ফিরে আসবে — মুশকিলটা কী? শান্তি-মাসিকে বললেই হবে আউটডোর শুটিং-এ যাচ্ছো।' 'আমি মিথ্যে বলতে পারবো না।' 'মিথ্যেটা না-হয় আমিই বলবো — তাহ'লে হবে?' 'না, থাক! আপনার বন্ধু কলকাতায় আসুন — তখন যা হবার হবে।' 'তুমি তো ভারি ছেলেমানুষ দেখছি। আচ্ছা, চলো, এই কাছেই থাকে প্রফুল্ল নাগ, আমার বন্ধুর পার্টনার হবে সে, তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।' কিছুক্ষণ পরে একটা গলির মধ্যে সে ট্যাক্সি থামালো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে অম্বু বললো, 'প্রফুল্ল বাড়ি নেই দেখছি। তা এসেই যখন পড়েছি একটু ব'সে যাওয়া যাক।' পকেট থেকে চাবি বের ক'রে দরজার তালা খুললো অম্বু, ঘরে আলো জ্বেলে দিলো। তাকে অন্যের বাড়ির তালা খুলতে দেখে আমি অবাক হলাম, আরো অবাক হলাম ঘরে ঢুকে। এ কি সম্ভব যে কোনো ফিল্ম-কোম্পানির পার্টনার বাস করে

এখানে? কোনো ভদ্রলোকের বাসা ব'লেও তো মনে হয় না। হতচ্ছাড়া চেহারার একটা ঘর, দেয়াল ঘেঁষে খাট, টেবিলে কয়েকটা কাচের গেলাশ সাজানো, এলোমেলো দু-তিনটে চেয়ার, জানলার তাকে কয়েকটা খালি বোতল দাঁড়িয়ে আছে। আমাব গলা চিরে আওয়াজ বেবোলো, 'এখানে আমাকে নিয়ে এলেন কেন?' 'আর খুকিপনা কোরো না তো, কমলা, তোমার তো একবার বিয়েও হয়েছিলো শুনতে পাই,' ব'লে অম্বু দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে সারা মুখে ভাঁজ ফেলে হাসলো। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেলো, তবু মনে জোর এনে বললাম, আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে!' 'ভয় কী, আমি তোমাকে খুন করার জন্য নিয়ে আসিনি এখানে—দ্যাখো আমার পকেট, ছোরাটোরা কিচ্ছু নেই, বরং একটা ভালো জিনিশ আছে।' পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের ক'রে অম্বু গেলাশে ঢাললো খানিকটা, সেটা হাতে নিয়ে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, 'শোনো কমলা, ছটফট ক'রে কিচ্ছু লাভ নেই। এটা তো জানো, তোমার শান্তি-মাসিকে আমি যা বোঝাবো তিনি তা-ই বুঝবেন? আর আমার কথামতো চললে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। এসো, একটু আনন্দ করা যাক।' অম্বু বাঁ হাতে আমার কোমব জড়িয়ে ধ'রে লম্বা চুমুক দিলো গ্লাশে, তারপর গ্লাশটি আমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধ'রে বললো, 'একটু চেখে দেখবে নাকি? খাশা!' আমার মনে হ'লো আমি জলে ডুবে যাচ্ছি,

নিশ্বাস নিতে পারছি না, কিন্তু হঠাৎ ভগবান আমাকে বলবুদ্ধি জোগালেন। আমি আস্তে গ্লাশটা ওর হাত থেকে নিয়ে চুমুক দেবার ভান ধরলাম, হাসলাম একটু, ওর চোখে চোখ ফেললাম, তারপর একটু পেছনে স'রে গিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারলাম ওর মুখের ওপর। ঝনঝন কাচের শব্দ — অম্বুর গলার একটা অস্ফুট চীৎকার — কিন্তু আমি ততক্ষণে অন্ধের মতো নেমে এসেছি রাস্তায়, আমাব বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছে, কেমন ক'রে বাড়ি পৌঁছলাম মনে নেই।

'শান্তি-মাসি, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর ফিল্মে কাজ করতে বলবেন না। ··না, পারবো না আমি, কিছুতেই না, আপনি আমাকে দয়া করুন।' আমি যতই কাঁদি, মেসো যতই বোঝান, মাসি অনড়। 'অম্বু বললো তোর জন্য একটা বড়ো পার্ট জোগাড় করেছে — হাজার-হাজার টাকা হবে তাতে, আর তুই সেটা ছেড়ে দিতে চাস! কেন, হয়েছে কী?' 'কিছু হয়নি — আমার ভালো লাগে না।' 'ভা-লো লা-গে না।' মাসি ভেংচিয়ে উঠলেন, 'ঢং দ্যাখো মেয়ের! তোর কী ভালো লাগে আর লাগে না তাতে কার কী এসে যায় রে? তোর কি ভাতার আছে, না মা-বাপ আছে, না মাথা গোঁজার জায়গাটাই আছে একটা! ভাবছিস আমার অবাধ্যতা ক'রে এ-বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবি? তোকে আমি ঘাড়ে ধ'রে রাজি করাবো।' এমনি কাটলো দু-তিন দিন, তারপর হঠাৎ একদিন মাসির চীৎকারে বাড়ি ফেটে পড়লো — 'হারামজাদি! তোর পেটে এত বিদ্যে! লুকিয়ে-

লুকিয়ে পিরিত চালাচ্ছিস অম্বুব সঙ্গে! আমারটা খেয়ে আমারই ঘরে সিঁদ কাটবি, এত আস্পর্ধা তোর! নচ্ছার মেয়ে — বেলেল্লাপনাব আব জায়গা পাসনি! দ্যাখ — তোর নাঙ তোকে কী লিখেছে দ্যাখ!' মাসি একটা দোমড়ানো কাগজ ছুঁড়ে মারলেন আমার মুখের ওপর, আমি সেটা খুলে দেখলাম। 'কমলা, আসানসোলে এসে অবধি শুধু তোমাকেই মনে পডছে। সেদিন যা হ'য়ে গেছে তার জন্যে তোমার কাছে মাপ চাইছি। কলকাতায় ফিরেই দেখা কববো তোমার সঙ্গে, তখন সব বুঝিয়ে বলবো। ইতি তোমারই অম্বু।' আমি তক্ষুনি বুঝলাম মাসি-বাড়ির পাট আমার চুকলো, একটি কথাও বের করতে পারলাম না মুখ দিয়ে, পারলেও মাসির কানে তা পৌঁছতো না — তাঁর চোখ তখন আগুন, গা থেকে কাপড় খ'সে পড়ছে, ঠোঁটে ফেনা তুলে চীৎকাব করছেন, 'বেরো, এক্ষুনি বেরো আমার বাড়ি থেকে, জাহান্নমে যা!' সঙ্গে-সঙ্গে স্রোতের মতো গালি-গালাজ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। আশে-পাশে জানলায়-জানলায় ভিড়, বাচ্চাটি গড়িয়ে-গড়িয়ে কাঁদছে, ছোটো মেয়েটিও কেঁদে ফেলছে ভয় পেয়ে, মেসো না-খেয়ে আপিশে চ'লে গেলেন — সেই রণচণ্ডী মূর্তির সামনে এগোবাব মতো কলজে কারোরই হ'লো না। অবশেষে নেহাৎই ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন মাসি, যা-হোক কিছু খেয়ে নিয়ে মানিক আর বাণীরা স্কুলে-কলেজে পালিয়ে বাঁচলো, একটা সময়ে নীরব হ'লো বাড়ি। আমি সেই সুযোগে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

৫

তোমার মনে পড়ে, অবনী, সেই রাত্তিরটা, কুয়াশা, টালিগঞ্জের নির্জন গলি? ভাবলে এখনো একটু শীত-শীত করে আমার, গা যেন শিরশির করে। সন্ধেব পরে মহালক্ষ্মী স্টুডিও থেকে বেরিয়েছি। হ্যাঁ, সেখানেই আবার — আর-কোনো উপায় জানা নেই ব'লে সেখানেই। যদি কিছু হয়, যদি এক্ষুনি কিছু জুটে যায়। কিছু হ'লো না, কিন্তু দিনটা কাটিয়ে দেয়া গেলো ঘুরে-ঘুরে। কিন্তু এখন? হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমি গর্চা লেন-এ ফিরবো না, কোনোদিনই আর ফিরতে পারবো না। আসলে হঠাৎ নয়, আসলে দিন ভ'রে ঐ কথাটা ছিলো আমার সঙ্গে-সঙ্গে, মাথার মধ্যে পোকার মতো, বা যেন দাঁত-ব্যথা, বা আধ-কপালে মাথা-ধরা — অ্যানাসিনের বড়ি গিলে-গিলে দাবিয়ে রাখছি, কিন্তু আছে সব সময়, ভোঁতা, চিনচিনে, নাছোড়। আমি চেষ্টা করেছি ভুলে থাকতে, ভান করেছি যেন কিছু হয়নি, আর এখন দেখছি রাত হ'য়ে গেছে, এটা রাস্তা, আমি কোথায় যাবো জানি না। এতক্ষণে মেসো বাড়ি ফিরেছেন — তিনি কি চেষ্টা করবেন না আমার একটা খোঁজ নিতে? মুখ বুজে এত বড়ো একটা অন্যায় মেনে নেবেন? কিন্তু অন্যায় তো আমার; সব দোষ আমার, যেহেতু আমি একটা বেওয়ারিশ যুবতী মেয়ে। কিন্তু মেসো লোক ভালো, পুরুষমানুষ, তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বুঝবেন না — তা কি হ'তে পারে?

ফিরে যাবো? ছি, কমলা! তোমার একটা আত্মসম্মান নেই!

কিন্তু কোথায় যাই? কী করি আমি এখন?

মাঘ মাস, ঘন কুয়াশা, আবছা আলো গলিতে, চারদিক শুনশান। এতক্ষণ টের পায়নি, কমলা, কিন্তু এবারে তার সারা শরীর ছেয়ে ক্লান্তি নামলো। যেমন পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালে, সূর্যাস্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, গাছপালায় ডোবায় পুকুরে শেয়ালে জঙ্গলে জড়িয়ে-জড়িয়ে ঝামরে অন্ধকার নামে, তেমনি। খিদে পেয়েছে তার, বড্ড। শীত, একটা পাৎলা পুরোনো কম্বল তার গায়ে, কেঁপে উঠছে, চলতে পারছে না। তাহ'লে সে সত্যি আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, এই লক্ষ-লক্ষ মানুষের শহরে তার কোনো জায়গা নেই? না, কিছু হবে, হ'তেই হবে, সে তো আর ম'রে যেতে পারে না। পেছনে কোনো পায়ের শব্দ? তা-ই তো মনে হচ্ছে। ভারি জুতোর শব্দ, পুরুষের পায়ের। বলিষ্ঠ কোনো পুরুষ। পুরুষটির তাকে অনেক আগে ছাড়িয়ে যাবার কথা, কিন্তু কেমন পিছু-পিছু আসছে, তারই চলার তালে তাল মিলিয়ে। অম্বু না তো? একটা শিউরানি নামলো কমলার মেরুদণ্ড বেয়ে, তারপরেই যেন ভয়ের ভাবটা কেটে গেলো তার, কোনো ভয় অনুভব করার মতো শক্তিও তার নেই এখন। সে যেন হাওয়ায় ঝুলছে; অম্বু, শান্তি-মাসি, আজ সকালের ঘটনা, সব অস্পষ্ট — সে শুধু একটু বসতে চায় কোথাও, শুতে চায়, আর-কিছু চায় না। কিন্তু না, অম্বু না, পায়ের শব্দটা অন্য

রকম, আর তাছাড়া অমন পিছু নেবারই বা দরকার কী অম্বুর, সে তো এখন মুখোমুখি এসে বলতে পারে, 'কেমন, শুনলে না তো আমার কথা! এবার?' তাহ'লে গুণ্ডা? ছেনতাই? হাসি পেলো কমলার — কী বা আছে তার বটুয়ায়, কিছু খুচরো আর বড়ো জোর একটা-দুটো টাকা; তার কী ভয়? কিন্তু অন্য ভয় নেই? সে তো মেয়েমানুষ। অম্বুর মতো কত আছে এই কলকাতায় তা কে জানে। 'ভগবান, রক্ষা করো!' একটা নিঃশব্দ চীৎকার উঠলো কমলার বুক থেকে, তারপরেই মনে-মনে বললো, 'আর ভগবান! রাস্তায় যে দাঁড়িয়েছে সে মেয়েও নয়, পুরুষও নয়, মানুষও নয়। আমাকে শক্ত হ'তে হবে, শক্ত হ'তে হবে।'

কড়কড় শব্দে একটা লরি চ'লে গেলো, প্রায় তার গা ঘেঁষে। দ্যাখো কাণ্ড, আর-একটু হ'লেই হয়েছিলো আরকি। তা, এমন আর ক্ষতি হ'তো কী, বরং ভালোই, আধ মিনিটে ভাবনা-চিন্তা শেষ। না, অমন এলিয়ে পড়লে চলবে না — শুনেছে দমদমে তার এক দাদু থাকেন, তাঁর কাছে চ'লে যায় যদি? মনে জোর এনে দ্রুত পা ফেললো সে, পট ক'রে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেলো, বাধ্য হ'লো থামতে। দেখতে পেলো সামনে ট্রাম-ডিপো, লোকজন, দোকানপাট, উজ্জ্বল। পর-পর কয়েকটা আলো-জ্বলা ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে, বাঁকা ভঙ্গিতে, যেন কোন সুখের দেশে যাচ্ছে ওরা, ডাকছে সকলকে 'এসো এসো', তাকেও। কলকাতার ট্রাম — না কি মাদারিপুরের স্টীমার-

ঘাটে সারি-সারি নৌকো, সে তার বাবার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে, ঐ আসছে স্টিমার, সারা গায়ে বাতি জ্বেলে, কালো নদী কাৎরে উঠছে সার্চ-লাইটের আলোয়, তার ঘুম পাচ্ছে। আমার চোখ ঝাপসা হ'লো, গা ভুলে উঠলো, আমি কোথায় আছি তা যেন ভুলে গেলাম, আর ঠিক তখনই দেখতে পেলাম তোমাকে, আমার পাশে, আমার দিকে তাকিয়ে।

'মাপ করবেন, মনে হচ্ছে আপনাকে মহালক্ষ্মী স্টুডিওতে দেখেছি?'

অচেনা লোকের সম্ভাষণে চমকাইনি আমি, সোজাসুজি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। তুমি কি আমাকে নির্লজ্জ ভেবেছিলে, খারাপ মেয়ে ভেবেছিলে? কিন্তু আমি তো খারাপই, আমি সব বুঝেও নিজের স্বার্থে অম্বুকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তাকে ধ'রে ফিল্মের ওপর-তলায় উঠতে। সে যদি আচমকা ও-রকম একটা কাণ্ড না-করতো, যদি ভয় পাইয়ে না-দিতো আমাকে, তাহ'লে — কী হ'তো কে জানে। আর যদি সেই মুহূর্তে অম্বু এসে আমার পাশে দাঁড়াতো, তাহ'লে আমি তার সঙ্গেই চ'লে যেতাম, যেখানে সে বলতো — হয়তো ঐ দোতলার কুৎসিত ঘরটাতেই, এমনি আমার অবস্থা তখন। কিন্তু কত ভাগ্যে অম্বু আসেনি, তুমি এসেছিলে। তুমি, অবনী। আমার উদ্ধারকর্তা, আমার জীবনদাতা, আমার স্বামী।

সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম দুটো-চারটে কথা — তোমার

মনে আছে? 'আপনি কি কাজের চেষ্টায় স্টুডিওতে গিয়েছিলেন? … হ'লো না?' 'কই আর হ'লো।' 'তাহ'লে —' তুমি কথা শেষ করলে না, আমিও কিছু বললাম না, কিন্তু তুমি বুঝে নিলে। সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছো, চওড়া বুক, গায়ের রং কালো, মুখের ছাঁদ পুরুষালি ধরনের সুশ্রী। আমি ছেড়া স্যাণ্ডেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলাম, তুমি বললে, 'ছিঁড়ে গেলো বুঝি? তা আমি একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি কি কোথাও?' ট্যাক্সি শুনেই অন্তুকে মনে পড়লো আমার, কাঁপা গলায় ব'লে উঠলাম, 'না! আমি ট্রামেই যাচ্ছি। আমি অনেক দূরে থাকি।' 'অনেক দূরে? কোথায়?' আমার মনে প্রথমে যে-নামটা এলো সেটাই ব'লে ফেললাম, 'দমদমে।' 'দমদমে কিন্তু ট্রামে যাওয়া যায় না।' আবছা আলোয় তোমার চোখে আমার চোখ পড়লো, আমি মাথা নিচু করলাম। একটু পরে তুমি বললে, 'আমার একটা আস্তানা আছে, ইচ্ছে করলে আজকের রাতটা সেখানে কাটাতে পারেন।' কেমন সহজে বললে কথাটা, যেন এতে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। 'আর আপনি?' নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেলো আমার মুখ দিয়ে, বলামাত্র বুঝলাম এক অচেনা অজানা পুরুষের বাড়িতে রাত কাটাতে আমি রাজি হয়েছি। আর তারপর ট্যাক্সিতে ব'সে — আরামে, অন্ধকারে, গাড়ি চলার দুলুনিতে — আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম, কোনো-কিছু ভাবার ক্ষমতা আর রইলো না। একবার জিগেস করলাম, 'আপনিও কি ফিল্মে কাজ করেন?'

'তেমন কিছু করি না — এই সীন-টীন আঁকি মাঝে-মাঝে।' 'আর ?' ' "আর" মানে ?' 'আপনার কথা কিছুই জানি না।' 'আমিও তো আপনার কথা কিছুই জানি না। তার কোনো দরকার আছে আপাতত ?' 'না, দরকার কিছু না।' ট্যাক্সির কোণে হেলান দিয়ে আমি চোখ বুজলাম, উঠে এলাম তোমার সঙ্গে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধের মতো। খেলাম তুমি যা নিয়ে এলে, পশুর মতো ঘুমোলাম সারা রাত। জানলাম না যে এই বিছানা তোমার, আমার গায়ে তোমার কম্বল, তুমি পাশের ঘরে মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছো : তোমার অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্ব, সব ভুলে রইলাম। সকালে উঠে বুঝলাম এটা হাজরা রোডের মোড়, একটা তেতলা বা চার-তলার ফ্ল্যাটে আছি আমি, অবাক হ'য়ে গেলাম ঘর দেখে, তোমাকে দেখে। কী সহজে সব হ'য়ে গেলো, স্বপ্নের মতো।

৬

একটু আগে তারই বয়সী একটি মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। 'আমি তোমার খুড়তুতো জা, আমার নাম মল্লিকা। তোমার হাতটা দেখি একটু,' ব'লে লাল মখমলের বাক্স থেকে একটি আংটি বের করলো, ছোট্ট তারার মতো তিনটে হীরে-বসানো। নিজের আংটি-পরা আঙুলের দিকে তাকালো কমলা, তাকালো ঘরের চারদিকে, ড্রেসিং-টেবিলে কত রকম

প্রসাধান সাজানো, কত রঙের শাড়ি ঝুলছে আলনায়। রাত্তি হ'তে-হ'তে আরো কত জ'মে উঠবে। সব তার জন্য। সত্যি কি এরই মধ্যে তাকে এত ভালোবেসেছে সবাই? না, ভালোবাসা নয়, নিয়ম। নতুন বৌয়ের জন্য বরণ-ডালা, আশীর্বাদ। তার বিয়ের চিঠির তলায় লেখা আছে, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।' কিন্তু আশীর্বাদেরও একটা চিহ্ন চাই, যা চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, যা শুধু মুখের কথা নয়। যেমন সিঁছুর, যেমন শাঁখা, যেমন পুরুতের মন্ত্র। সেইজন্যেই এত শাড়ি, গয়না, আসবাবপত্র। চিহ্নের ওপরেই জীবন চলে, চিহ্নই সব। কমলার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা সুখের শিঁড়রানি নেমে গেলো — এর পর থেকে সে ছু-একটা ছোটো-ছোটো বিলাসিতা ভোগ করতে পারবে সে-জন্যে নয়, যে-কারণে এই সব উপহার সে পাচ্ছে সে-কথা ভেবে। 'আমি তোমার পিসতুতো জা,' 'ইনি তোমার মাস্-শাশুড়ি' — এই কথাগুলো ঘুরছে তাকে ঘিরে-ঘিরে। সে আজ রাতারাতি কারো জা হ'তে চলেছে, কারো বৌদি, কারো বা কাকিমা, অন্য কারো নাতবৌ। এরই মধ্যে যেন তার শেকড় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, এই সংসারে; আশে-পাশে অনেক নতুন মানুষ একটু স'রে-স'রে গিয়ে, একটু বদলে গিয়ে, তাকে নিয়ে অন্য একটা ছবি তৈরি করছে। এই ছবিতে সে আর অবনী পাশাপাশি, এ-মুহূর্তে ঠিক মাঝখানটিতে, কিন্তু অন্য কাউকে বাদ দিয়ে নয়। পুনর্মিলন হ'লো অবনীর সঙ্গে তার বাড়ির লোকেদের, একটা বিজ্ঞাপনের আপিশে ভালো চাকরিও

হ'লো তার — চাকরি ঠিক ক'রে দিয়েছেন তার সেই কাকা-বাবু, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে দেড় বছর আগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ভালোই হ'লো, রোদে বৃষ্টিতে অবনীকে আর ঘুরতে হবে না কাজের খোঁজে, টাকা আদায়ের চেষ্টায়, সারা রাত জেগে সিনেমার সীন আঁকতে হবে না। ভদ্র জীবন, স্থিতি, সচ্ছলতা। আজ কেউ-কেউ ঠোঁট বাঁকাচ্ছে অবশ্য, বলছে এ কী বিশ্রী একটা বিয়ে করলো অবু — কিন্তু ও-সব আর ক-দিন। সব ভুলে যাবে সবাই, না-ভুলে উপায় থাকবে না। 'বৌমা,' 'বৌদি,' 'কাকিমা,' 'মামিমা'.— ও-সব নামের মধ্যেই জাদু আছে। বেশিদিন নিন্দে করা যায় না, তাতে যে নিজেদেরই নিন্দে। আর যদি বা নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু চুকলি কাটে, অন্য কেউ কিছু বললেই রুখে উঠবে — এরই তো নাম আত্মীয়তা। তাছাড়া সে, কমলা — যেহেতু সে আনকোরা নতুন বৌ নয়, বাসি, বলতে গেলে ডবল-বাসি — তাই সেও চেষ্টা করবে এঁদের মনোমতো হ'তে, এঁদের খুশি করতে — কাজে, সেবায়, মিষ্টি কথায়, নম্র ব্যবহারে। না, তাকে চেষ্টাও করতে হবে না, ও-সব আপনিই আসবে — এখনই সে ভালোবাসছে এই বাড়ির লোকেদের, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই — যে-ননদ 'ফার্স' ব'লে গেলো এমনকি তাকেও। কমলা জানে এর প্রতিদান পেতেও দেরি হবে না তার, এঁরা আজকে যেটা 'লৌকিকতা' করছেন, তা-ই থেকেই আস্তে-আস্তে ভালোবাসা জন্মাবে এঁদের মনে; যত দিন যাবে তত সে আরো বেশি হবে এ-বাড়ির বৌ, এঁদেরই

একজন, যাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই আর ঘটবে না — না বিয়ে, না কোনো শিশুর জন্ম, না কোনো মৃত্যু।

অবশ্য এই বিয়ে নিয়ে তুমুল হুলুস্থুল গেছে কিছুদিন — এই বীডন স্ট্রিটের বাড়িতে। সব কথা তাকে বলেনি অবনী, কিন্তু কমলা তার মুখ দেখে, আর দুটো-একটা কথা শুনেই বুঝে নিয়েছে। বোঝা তো শক্ত নয় — এ-বাড়ির ছেলে একটা তিন-কুল-খোয়ানো রাস্তায়-কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে ঘরে আনতে চাচ্ছে, এটা এঁদের পক্ষে বজ্রাঘাত ছাড়া আর কী। তিন পুরুষ ধ'রে শাঁসালো এই বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যেরা, চারদিকে আত্মীয়-কুটুমের মধ্যে গরিব কেউ নেই, এঁদের কাছে বিয়েটাও হ'লো মান-সম্মান টাকা বাড়াবারই একটা উপায়— এরই মধ্যে অবনী হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ক'রে ফেললো যা এঁদের প্রায় কল্পনার পরপারে। সত্যি বলতে, অবনী শুরু থেকেই অবাধ্য ; কাকার কথামতো আইন পড়তে রাজি হয়নি কিছুতেই, জোর ক'রে ভর্তি হয়েছিলো আর্ট-কলেজে, শেষটায় রাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছিলো বাড়ি থেকে কিছু কাপড়চোপড় আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে। ছবি আঁকবে সে, আর-কিছু করবে না : এই তার জেদ। তা শেষ পর্যন্ত তার এই আবদারটা নিশ্চয়ই মেনে নিতেন বাড়ির সবাই — বিধবা মায়ের এক ছেলে সে, এমন নয় যে চালচুলো নেই বা রোজগার না-করলে দিন চলবে না, না-হয় রং-তুলি নিয়ে খেলাই করতো অবনী, যতদিন তার ভালো লাগতো। কিন্তু — বিয়ে! ও-রকম একটা হাড়-হাভাতে জাতগোত্রহীন মেয়েকে! বলছি

ভদ্রঘরের মেয়ে, রেফিউজী — কিন্তু কে জানে। বেজন্মা কিনা তারই বা ঠিক কী? না কি তার চেয়েও খারাপ কিছু? ক বলেছিলেন (বিয়ের তারিখ ঠিক হ'য়ে যাবার পর এ-সব ভ তাকে বলেছিলো), 'কুচ্‌পরোয়া নেই, বয়সকালে ও-সব ফুর্তি-ফার্তি অনেকেই ক'রে থাকে, এবারে তুই মেয়েটাকে ছেড়ে দে, আমি ওর হাতে হাজারখানেক টাকা গুঁজে দিচ্ছি। তোর একটা খুব ভালো সম্বন্ধ আমাদের হাতে আছে এক্ষুনি।' শুনে অবনী বলেছিলো, 'আপনি ভুল করছেন, আমি বাগানবাড়ির বাবু নই, টাকা দিয়ে শরীর কিনি না।' মা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনেক বুঝিয়েছিলেন, চোখের জল ফেলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটা মিথ্যে বলার মতো বুদ্ধি জুগিয়েছিলো অবনীর — 'মা, আমি ওকে রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে করেছি, কাজেই এ নিয়ে কথা বলা বৃথা।' অগত্যা, ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য বিধবা মা নরম হয়েছিলেন, আর অবনীও, মা-কে কিছুটা খুশি করার জন্য, তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো কমলার সেই মাসিকে, যিনি তাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর অনেক খুঁজে-খুঁজে দমদম থেকে তার দাদুকে, যাঁর কাছে চ'লে যাবার কথা কোনো-এক সময়ে ভেবেছিলো সে, আর যিনি সাত বছর পর কমলাকে দেখে চিনতে পর্যন্ত পারেননি। এঁদের কাছে এ-বাড়ির লোকেরা অন্তত তার বাবার নাম, গ্রামের নাম জানতে পেরেছিলেন, এটুকুও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে তারা চাটুয্যে বামুন, জাতে-গোত্রে মিলে যাচ্ছে অন্তত, বংশ নিচু নয়। মাসির চোখ

কপালে উঠেছিলো কমলার ভাবী শ্বশুরবাড়ির জাঁক-জমক দেখে, তার বাপের বাড়ির এমন একটি রঙিন ছবি তিনি এঁকেছিলেন যেন মাদারিপুরে তাদের তালুক-মুলুক কিছুরই অভাব ছিলো না, তারপর তেলতেলে গলায় অবনীর মা-কে বলেছিলেন, 'নিজেদের মেয়ে ব'লে বলছি না, দিদি, কমলা সত্যি খুব ভালো মেয়ে, আর ছেলে যখন নিজে পছন্দ করেছে তখন তার ওপরে আর কথা কী।' তারপর ট্যাক্সিতে উঠে কমলাকে চুপি-চুপি বলেছিলেন, 'এবারে তুই বড়োলোক হলি কমলা, আমাকে মনে রাখিস — আমি তোর মা-র আপন খুড়তুতো বোন, সম্পর্ক তো ফ্যালনা নয়। আর শোন, বাণী এই ষোলোয় পড়লো, ওর জন্যে একটা ভালো সম্বন্ধ —' ইত্যাদি। কমলার যে আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো, সে-বিষয়ে মাসি, দাদু টুঁ শব্দটি করেননি, অবনী তাঁদের আগে-ভাগেই জপিয়ে এনেছিলো (দাদু তা জানতেনও না খুব সম্ভব — বা শুনে থাকলেও মনে ছিলো না); আর সে যে একবার সিনেমার নটী হ'তে গিয়েছিলো, সে-কথাটাও বিলকুল চেপে গিয়েছিলেন মাসি। কমলার জন্যে এখন মিথ্যে বলতে রাজি তাঁরা, কেননা সম্পর্ক যত দূরই হোক বড়োলোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা ভালো, কখন কোন কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। ঐ দাদুই আজ সম্প্রদান করবেন তাকে, মাসি আসবেন সগৌরবে সপরিবারে কন্যাপক্ষ হ'য়ে। উকিল-কাকার শেষ পর্যন্ত মত ছিলো না, কিন্তু ছেলের মুখ চেয়ে অবনীর মা জোর দিলেন। এমনি ক'রে, কিছু ছলনা,

কিছু দয়া, কিছু লোভ, আর সবচেয়ে বেশি বিধবা মায়ের দুর্বলতা — এই সবের ওপর দাঁড় করানো হ'লো তার এই দেড় বছর ধ'রে মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত বিয়েকে। কিন্তু কী এসে যায় ঐটুকু ছলনায়, মাসির চোখের চকচকে লোভে কী এসে যায় — সে নিজেও ভুলে যাবে যে আগে একবার তার বিয়ে হয়েছিলো, ছিলো মাদারিপুরে গরিব ঘরের মেয়ে, তারপর কলকাতার রাস্তায় দাড়িয়েছিলো — এখনই ভুলে যাচ্ছে, এখনই সে হ'য়ে উঠছে পুরোপুরি বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যে-বাড়ির বৌ, যার আলমারিতে থরে-থরে সাজানো থাকবে বেনারসি কাঞ্চীপুরম মুর্শিদাবাদ, মাঝে-মাঝে যার অঙ্গে শোভা পাবে হীরের আংটি, মুক্তোর মালা, জড়োয়া ব্রেসলেট। এত সুখ সে কি কল্পনাও করেছিলো কখনো?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো কমলার, মনে পড়লো টালিগঞ্জের সেই বাড়িটা। দু-খানা ঘর, বারান্দা, পেছনের দিকে ছোট্ট উঠোন। যেখানে অবনী তাকে নিয়ে উঠেছিলো, তখনও মাঘ মাস চলছে, শীত ফুরিয়ে এলো, সরস্বতী পুজো কাছেই। ভাড়া কম, হাজরা রোডের তুলনায় জায়গাও বেশি। শস্তা চেয়ার-টেবিল, দুটো-চারটে হাতা খুন্তি বাসন, অবনীর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। আর দু-ঘরে দুটো তক্তাপোশ, একটাতে শোওয়া, আর-একটায় ছবি আঁকে অবনী, আশে-পাশে ছড়িয়ে থাকে রং তুলি কাগজ পেন্সিল আরো কত কী। এই জগৎ-সংসারের কোনো আনাগোনা নেই সেখানে, কমলাকে 'কাকিমা' বা 'বৌদি' ব'লে ডাকার কেউ নেই — সে আর অবনী, অবনী

আর সে, এই দিয়ে তৈরি সেখানে সব-কিছু — সেই বাড়ি, যেখানে তারা মিলিয়ে দিয়েছিলো জীবনের সঙ্গে জীবন, একের সঙ্গে এক যোগ ক'রে আরো বড়ো আশ্চর্য এক খুঁজে পেয়েছিলো। সেই বাড়ি — তা কি সে ভুলতে পারে কোনোদিন ?

আজও আমার ভাবতে অবাক লাগে, কেমন ক'রে সেটা হ'তে পেরেছিলো, অবাক লাগে অবনীর কথা ভাবতে। ওর নিজেরই কষ্টে চলে, তার ওপর আব-একটা মানুষের ভার, দায়িত্ব। আর কী-রকম মানুষ ? রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া একটা মেয়ে, যে জানে না আজ রাত্রে সে কোথায় ঘুমোবে। যার বিষয়ে এটুকু পর্যন্ত জানার উপায় নেই সে সত্যি কে, কী, দুঃখী না অতি ধূর্ত মেয়ে-জোচ্চোর, অভাগী না দুশ্চরিত্র। দয়া ? দয়া ক'রে কিছু দান করে লোকেরা, কেউ হয়তো দু-চার দিন আশ্রয়ও দেয়, কিন্তু তাই ব'লে এমনি ক'রে বিকিয়ে যাওয়া, বোকার মতো, অন্য কোনোদিকে না-তাকিয়ে! তবে কি পুরুষের যে-লোভ সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে, তা-ই ? ছি! কী ক'রে ভাবতে পারলাম কথাটা, আমি যে চিনি অবনীকে। সেই হাজরা রোডে: তার ঘর ছেড়ে দিয়েছে আমাকে, নিজে ঘুমিয়েছে কম্বল পেতে ছোটো ঘরটায়, আমার জন্য সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে বেশি কথা না-ব'লে, ভঙ্গিটা লাজুক অথচ সহজ, যেন ব্যাপারটা বিশেষ-কিছু নয়, রোজই ঘটছে এ-রকম। সেদিন, সেই প্রথম রাত্রির পরে, আমার একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো, চোখ মেলে কয়েক মিনিট

লাগলো ঘটনাটা বুঝে নিতে, আর তারপর লজ্জায় আমি কোনোদিকে তাকাতে পারি না, নড়তে পারি না বিছানায়, শরীর যেন পাথর। কিন্তু অবনী দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে বেরোতে হচ্ছে এক্ষুনি, নিচের রেস্তোরাঁ থেকে আপনাকে চা দিয়ে যাবে, দুপুরবেলা খাবার দিয়ে যাবে। যদি বেরোতে হয় দরজায় তালা দেবেন কিন্তু — এই যে তালা-চাবি। আর ঐ বইটার মধ্যে কিছু টাকা — মানে হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়। দোকানপাট সব কাছেই।' দিনেব বেলায় একটু অন্য রকম দেখলাম অবনীকে, দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে এসেছে এইমাত্র, চোখের কোণ দুটো লালচে, ভাঁজ-ভাঙা শার্টটা ফুলে উঠেছ বুকের ওপর — হাঁটার ভঙ্গিটা টগবগে। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভাবলাম — 'ছি! আমি একটা কথাও বললাম না, দুপুরে উনি খেতে আসবেন কিনা তাও জিগেস করলাম না — আর কিছু না হোক, ভদ্রতা আছ তো।'

মাসখানেক ছিলাম সেখানে। ঐটুকু বাড়িতে দু-জন মাত্র মানুষ, বেশিক্ষণ লজ্জা টেকে না, এক ধরনের চেনাশোনাও শুরু হ'য়ে যায়। দু-দিন কাটলো, তিন দিন কাটলো, আমি নিজের কথা একটু-একটু বলি—আমার একটা যে-কোনোরকম কাজকর্ম কি জোটে না কোথাও? 'চেষ্টা করবো—নিশ্চয়ই।' 'দমদমে আমার এক দাদু আছেন, আমার মা-র মামা, কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানি না এই হ'লো মুশকিল।' 'কেন? এখানে আপনার অসুবিধে হচ্ছে?' 'অসুবিধে কিছুই নেই সেটাই অসুবিধে বলতে পারেন।' 'তার মানে?' 'এ-ভাবে তো

বেশিদিন চলতে পারে না।' 'কিছুদিন চলতে পারে তো? কোথাও কোনো কাজকর্ম হ'লে চ'লে যাবেন।' 'চ'লে যাবেন—' অবনী যে অত সহজে বললো কথাটা, সেটা যেন খচ ক'রে বিঁধলো আমাকে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমি ম্যাট্রিক অবধি পড়েছিলাম, বাচ্চাদের পড়াতে পারি, আমি শেলাই জানি, শুনেছি কলকাতায় ঘরে ব'সে শেলাইয়ের কাজ পাওয়া যায়?' 'খোঁজ নেবো।' আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অবনী হঠাৎ বললো, 'আমার একটা উপকার করবেন? মহিলাদের জামা-কাপড় বিষয়ে কিছুই জানি না আমি, আপনি কি খান দুই শাড়ি আর কয়েকটা ব্লাউজ কিনে আনতে পারবেন?' আমার সারা মুখে আলপিন ফুটলো এই কথা শুনে, কিন্তু একখানা মিলের শাড়ি, একটা দেড় টাকা দামের ব্লাউজ, আর অন্য দু-একটা মেয়েলি জিনিশ না-কিনেও পারলাম না, কেননা আমার শাড়ি-জামার দুর্গন্ধ আমার নিজেরই অসহ্য লাগছিলো — এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম মাসি-বাড়ি থেকে। অগত্যা আমাকে হাত পেতে টাকাও নিতে হ'লো — যে আমার কেউ নয়, যাকে মাত্র তিন দিন আগে প্রথম চোখে দেখলাম, তারই কাছে। সারাটা দিন ছটফট ক'রে কাটলো আমার; সন্ধের পরে অবনী বাড়ি ফিরে বললো, 'আমি নিজের বুদ্ধিতে কয়েকটা জিনিশ আনলুম, দেখুন তো কোনো কাজে লাগবে কিনা।' প্যাকেট খুলতে বেরোলো তোয়ালে সাবান পাউডার ইত্যাদি প্রসাধনের টুকিটাকি, এমনকি একটা মেয়েদের মোটা চিরুনি

আর চুলের ফিতে-কাঁটা পর্যন্ত। জিনিশগুলো দেখে আমার মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠলো — আমার জন্য, আমার কথা ভেবেও কেউ কিছু আনতে পারে তাহ'লে! কিন্তু তক্ষুনি আমার বুদ্ধি আমাকে বললে যে আমার রাগ করা উচিত, অপমানিত বোধ করা উচিত, খুব কঠিন স্বরে কিছু বলা উচিত অবনীকে, তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে আমি যদিও নিরুপায় হ'য়ে তার আশ্রয় নিয়েছি, আমার জন্য শৌখিন উপহার আনার অধিকার তাকে আমি দিইনি। আমাকে চুপ দেখে অবনী বললো, 'কী, কোনোটাই কাজে লাগবে না আপনার ?' আমি রাগের ঝোঁকে বললাম, 'আপনি কি আমাকে পোষা পাখি ক'রে রাখতে চান ?' অবনী ফ্যাকাশে হ'য়ে বললো, 'কী আশ্চর্য, হাতি-ঘোড়া ব্যাপাব নয় তো কিছু, সামান্য কয়েকটা — এ-সব তো দরকার হয়।' মুহূর্তের জন্য তার চোখে চোখ পড়লো আমার, সেই চোখে আমি সরলতা আর বিশ্বাস ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'কিন্তু আমি আপনার ঋণী হ'য়ে থাকতে চাই না, আপনাকেও কিছু নিতে হবে আমার কাছ থেকে।' ব'লেই ভয় হ'লো, পাছে অবনী এর অন্য রকম কোনো অর্থ করে, তাই তক্ষুনি আবার বললাম, 'রোজ-রোজ কেনা খাবার খাওয়া বড্ড খরচ, আমি তো রাঁধতে পারি।' 'না — না — ও-সব হাঙ্গামা আবার কেন ?' 'হাঙ্গামা কিছুই নয় — আমি সারাদিন শুধু আইঢাই করি শুয়ে-ব'সে, তবু একটা কাজ হবে আমার। আর-এক কথা —' 'বলুন !'

'মানে, বলছিলাম কী — আপনি আপনার ঘরেই থাকুন, ঐ ছোটো ঘরটায় কোনো কষ্ট হবে না আমার।' 'আমারও কোনো কষ্ট হয় না ওখানে।' 'কিন্তু আপনার বাড়িতে আপনি মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাবেন, এ কী-রকম কথা ?' 'আমি ইচ্ছে করলে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাতে পারি, কিন্তু আপনি আবার একা বাড়িতে ভয় পাবেন না তো রাত্তিরে ?' 'সে কী ! আমার জন্যে একেবারে ঘরছাড়া হবেন ? এমনিতেই তো রাতটুকু ছাড়া বাড়ি থাকেন না। করেন কী সারাদিন ?' 'কাজ — আড্ডা — কাজ — কত কী।' 'অন্তত দুপুরবেলা খেতেও তো আসতে পাবেন। আমাব কথা এতই যদি ভাবেন, তাহ'লে —' কথাটা আমি শেষ করলাম না, হঠাৎ মনে হ'লো বড্ড বেশি এগিয়ে যাচ্ছি, এই ধরনের হালকা খোলামেলাভাবে আমাব কথা বলা উচিত নয় অবনীর সঙ্গে, নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে না-রাখলে কিসে থেকে কী হ'য়ে যায় কে জানে। গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'যা-ই হোক, কাল থেকে আমিই রান্না করবো।' অবনী হেসে বললো, 'বেশ, তা-ই হবে।'

কেনা হ'লো জনতা-স্টোভ, কেরোসিন, কিছু বাসন-কোশন, আমাব রান্না খেয়ে 'বাঃ' বললো অবনী। আমি সকালে উঠে চা করি, চা খেয়ে অবনী বাজার এনে দেয়, ব'সে-ব'সে কাগজ পড়ে কিছুক্ষণ, আমি রান্না চাপাই, অবনী আগের রাত্রে শুরু-করা কোনো ছবিতে তুলি চালায় কি পেন্সিল নিয়ে নতুন কোনো ড্রয়িং করে — এগারোটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে

বেরিয়ে যায়। এই যে কিছু করার আছে আমার, সকালে উঠে চা করতে হবে কারো জন্য, কাউকে রেঁধে খাওয়াতে হবে, এতে যেন অনেকটা হালকা হ'লো আমার মন, দিনগুলো তেমন শূন্য আর মনে হ'লো না। আস্তে-আস্তে, প্রায় অজান্তে, অবস্থার চাপে, পরস্পরের ওপর কিছু-কিছু নির্ভর করা শুরু হ'লো আমাদের, আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে চা ফুরিয়ে এলো, সেও হয়তো একদিন লাজুক মুখে বলে, 'আজ জলপাই আনলুম, চাটনি বানানো কি সম্ভব?' — কিন্তু অস্বস্তি, তবু অস্বস্তি, আমার শান্তি নেই। আমি যেন ভেবে পাই না ঠিক কী-রকম সুরে কথা বলবো অবনীর সঙ্গে: কেমন ক'রে বললে ভদ্রতা বোঝাবে কিন্তু আগ্রহ ফুটবে না। নানা বিষয়ে কথা হয়, এক কথা থেকে আর-এক কথা ওঠে, কিন্তু কখনো যদি হাসিঠাট্টার সুর লাগে, কি আমি মন খুলে হেসে উঠি কখনো, তক্ষুনি আমি যেন নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যাই, আমার মনের মধ্যে কে যেন ব'লে ওঠে, 'সাবধান!' অথচ সারাক্ষণ গোমড়ামুখ ক'রে থাকাও যায় না — আর কেনই বা তা থাকবো আমি, অবনী আমার জন্য যা করেছে, যা করছে, তার প্রতিদানে আমি সত্যি কিছু দিতে চাই — আর মাঝে-মাঝে এমন মুহূর্ত আসেই যখন আমি ভুলে যাই নিজেকে, প্রায় 'আপন জনে'র মতো কথা বলি তার সঙ্গে, আর সেও সেটা সহজে মেনে নেয়। আর সেই মুহূর্তগুলোই পরে আমাকে লজ্জা দেয়, এক বলতে-না-পারা অপরাধবোধে আমার নিশ্বাস যেন বিষিয়ে ওঠে। 'আর কতদিন চলবে

এ-ভাবে?' যতবার এ-কথা জিগেস করি, অবনীর সেই একই জবাব, 'দেখা যাক।'

আমার সবচেয়ে অস্বস্তি হয় রাত্রে, যখন শুতে যাই। যেই আলো নিবিয়ে দিই, তখনই অবনী যেন অচেনা হ'য়ে যায় আমার কাছে — অন্য এক মানুষ যেন — দুঃখ লজ্জা রাগ আর অক্ষমতা মেশানো একটা ছটফটানি আমাকে দখল ক'রে নেয়, মনে হয় আমি সত্যি খাঁচার পাখি, জেলখানার কয়েদি, অন্ধকারকে মনে হয় পাথরের দেয়াল, আমি মাথা ঠুকছি, বৃথাই মাথা ঠুকছি — হয়তো এর চেয়ে শান্তি-মাসির লাথি-ঝাঁটাও ভালো ছিলো। নানারকম অদ্ভুত ভাবনা ঘিরে ধরে আমাকে। আমি শোবার আগে দরজা বন্ধ করি, খুব আস্তে তুলে দিই ছিটকিনিটা, কিন্তু টুক ক'রে যেটুকু শব্দ হয় তাতে যেন নিজেই চমকে উঠি — অবনী শুনলো না তো, সে ভাবছে না তো আমি তাকে অবিশ্বাস করছি? সে — এমন উদার, পরোপকারী, সচ্চরিত্র, এই নির্জন বাড়িতে, আমাকে পুরোপুরি তার মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে কখনো এমন কোনো ব্যবহার বা ভঙ্গি করেনি যাকে বলা যায় অশোভন, আমার পক্ষে অসম্মানজনক, তাকে অবিশ্বাস করা কি অন্যায় নয়, তাতে কি আমি নিজেই ছোটো হ'লে প্রমাণ হচ্ছি না? আমি শুয়ে-শুয়ে শুনি অবনীর নড়াচড়া, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালার শব্দ, আমার অসহ্য লাগে যে আমি তারই ঘরে, তারই বিছানায় শুয়ে আছি, আর তাকে শুতে হচ্ছে মেঝেতে একটা কোনোরকম বিছানা পেতে, আমার সন্দেহ হয় কোনো-একটা

ধূর্ত উদ্দেশ্য নিয়েই এই ব্যবস্থার বদল হ'তে সে দিচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে কেমন-একটা আক্রোশে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি। বালিশ কম্বল চাদর থেকে উঠে এসে একটা ভোঁটকা কড়া পুরুষালি গন্ধ যেন জাপটে ধরে আমাকে, আমার কান গরম হ'য়ে ওঠে, গা থেকে কম্বল ফেলে দিই, ইচ্ছে করে রাস্তার ধারের ছোট্ট ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হই, কিন্তু বেরোতেও পারি না, পাছে অবনী আমাকে দেখে ফ্যালে, কিছু বলে, পাছে এই নিশুতি রাতে ভদ্রতার দায়ে তার সঙ্গে কোনো কথা বলতে বাধ্য হই। এক-এক রাতে এই অস্থিরতা এত বেড়ে যায় যে আমি একলা ঘরে, বন্ধ ঘরে সারা গায়ে আঁচল টেনে নিঃসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকি — চোরের মতো, মড়ার মতো, যেন নিশ্বাস পড়ে না — শুয়ে-শুয়ে ভাবি, 'হে ভগবান, আর না, এই রাত্তিরটা ভোর হোক কোনোমতে, কালই আমি চ'লে যাবো — যেদিকে দু-চোখ যায় চ'লে যাবো — এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।' রাত বাড়ে, নীরব হ'য়ে আসে কলকাতা, আমি টের পাই অবনীর সুইচ টেপার শব্দ — আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে, তারপর কখন যেন আমিও ঘুমিয়ে পড়ি, আর সকালে উঠে, দিনের আলো দেখে, চায়ের জন্য স্টোভ ধরিয়ে, অবনীকে দেখে, তার গলার আওয়াজ শুনে, আমি তখনকার মতো অশান্তি ভুলে যাই, এমনকি আমার এও মনে হয় আমি ভালো আছি।

৭

কিন্তু, কমলা, তুমি খুকি নও, অজ্ঞান কুমারী নও, কলকাতায় এসে, মাসির বাড়িতে, অম্বুর খপ্পরে প'ড়ে, ফিল্ম-স্টুডিওর দোরে-দোরে ঘুরে, কিছু সারবান নতুন জ্ঞানও পেয়েছো। তুমি কি বোঝোনি কেন রাত্তিরে এই কষ্ট তোমার, কেন ভুলতে পারো না পাশের ঘরে অবনীর অস্তিত্ব, ভুলতে পারো না কম্বলের তলায়, আঁচলের তলায় তোমার শরীরটাকে? তুমি আর অবনী — তোমাদের বয়সী ছুটি ছেলে-মেয়ে একই ছাতের তলায় রাতের পর রাত কাটাতে থাকলে তার শেষ পরিণাম কী হ'তে পারে তা কি তুমি নিজের মনে বোঝোনি? শুধু হ'তে পারে নয়, হ'তে বাধ্য, সেদিকেই এগিয়ে চলেছো তোমরা। আর — সবচেয়ে যা ভয়ের কথা, সেই পরিণাম ভীষণ কিছু ব'লে মনে হচ্ছে না তোমার, তুমি যেন তা-ই চাচ্ছো মনে-মনে, অপেক্ষায় আছো কবে সেটা ঘটবে। অবনী খুব ভদ্র হ'তে পারে, কিন্তু কী ক'রে জানো তারও এটা মনের কথা নয়? সে তো পুরুষ, টগবগে যুবক, সে কি আর বেশিদিন নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে ভেবেছো? করছো কী, কমলা, কোথায় তুমি নামিয়ে আনছো নিজেকে — কেটে পড়ো এখান থেকে, এখনো সময় আছে।

এমনি সব ভাবনা আমাকে ঘিরে ধরেছিলো সেদিন — তখন দুপুর, অবনী বেরিয়ে গেছে, যত ভাবছি তত মনে হচ্ছে এই অবস্থা অস্বাভাবিক, অমানুষিক, অসহ্য — এক্ষুনি এর

অবসান চাই। আমি রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ফুটপাতে ভিড়, দোকানে-দোকানে কেনাবেচা চলছে, দলে-দলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে যাচ্ছে বা বাড়ি ফিরছে। কাজ, সকলেই ব্যস্ত — শুধু আমারই কিছু করার নেই, আমি একটা ফালতু মানুষ, বেঁচে আছি অন্যের দয়ায়, আর সেই দয়াও যাকে ব'লে বিপজ্জনক — অত্যন্ত। কিন্তু কী করতে পারি, কী করতে পারি আমি, কেমন ক'রে বাঁচাতে পারি নিজেকে, আমার তো সত্যি কেউ নেই কোথাও। আমি বারান্দা থেকে ঘরে এলাম, চেষ্টা করলাম খুব ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে। মাসির বাড়িতে আবার? অসম্ভব। তবে? 'যেদিকে দু-চোখ যায়' বললেই তো হ'লো না, কেউ পারে না পথে-পথে সারাক্ষণ ঘুরতে, রাস্তায় বেরোতে হ'লে যাবার কোনো জায়গা চাই, ফেরার কোনো জায়গা চাই। চাকরি, কাজকর্ম? নাঃ, কোনো আশা নেই। কী বা যোগ্যতা আমার, আর কাকেই বা চিনি যে ধরাধরি করবো। আবার মাথা ঠুকবো ফিল্ম-স্টুডিওতে? কী হবে — সেখানেও অগুনতি মেয়ে ঘুরঘুর করছে, আমার চাইতে অনেকে তারা অনেক বেশি যোগ্য। তবে? শুনেছি কয়েকটা আশ্রম হয়েছে কলকাতায় — অনাথ উদ্বাস্তু মেয়েদের জন্য, সেখানে তারা বেত বোনে, সোয়েটার বোনে, তাঁত চালায়, আচার-আমসত্ত্ব তৈরি করে, সে-সব জিনিশ বিক্রি হয় দোকানে-দোকানে, মেয়েগুলো থাকতে পায়, খাওয়া-পরা পায়। সুখের নয়, সম্মানের নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে ভদ্র জীবন, অন্তত দুটো কথা

বলার লোক পাওয়া যাবে, কোনো লোভ, কোনো ভয় সেখানে ছায়া ফেলবে না। নিশ্চয়ই ও-রকম কোনো আশ্রমে আমার জায়গা হবে? কিন্তু তার জন্যেও জোগাড়যন্ত্র চাই, হুট ক'রে গিয়ে দাঁড়ালেই তো হবে না — আর আমার কোনো ঠিকানাও জানা নেই। আমাকে পালিয়ে যেতে হবে, অবনীকে না-ব'লে — কিন্তু এক্ষুনি একটা রাত কাটাবার জায়গা না-পেলে কী ক'রে যাই? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? যদি চ'লে যাই দমদমে দাত্নর কাছে — তিনি বুড়োমানুষ, আমাকে ছেলেবেলায় অনেক দেখেছেন, কয়েকটা দিন থাকতে কি আর না দেবেন? আমি কিছু চাইবো না, শুধু বলবো, 'আমাকে একটা আশ্রমে ঢুকিয়ে দিন, অন্তত একটা ঠিকানা জোগাড় ক'রে দিন, আমি নিজেই সেখানে চ'লে যাচ্ছি।' প্রথমে শ্যামবাজার, বাস্-বদল ক'রে দমদম, সুভাষ-পল্লী, নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ দেখিয়ে দেবে? হ্যাঁ — এই ঠিক, এ-ই করতে হবে আমাকে, আজই, এক্ষুনি।

আশ্চর্য — অল্প ক-দিনেই কেমন মমতা জন্মে যায় মানুষের। যে-মানুষকে মাত্র কয়েক দিন ধ'রে দেখছি, তার জন্য মমতা, এই ছোট্ট বাসাটার জন্য মমতা, এমনকি অল্প-ব্যবহৃত বাসনকোশন হাতাখুন্তির জন্য। অবনী অন্য দিনের মতোই বাড়ি ফিরবে, আমাকে দেখবে না। তা কী আর করা যাবে, সে ঝোঁকের মাথায় করেছিলো এই কাজটা, নিজের গলায় পাথর ঝুলিয়েছিলো, আমি চ'লে গেলে সেও হাঁফ ছাড়বে। সে ভালো ঘরের ছেলে (অন্তত হাবে-ভাবে

তা-ই মনে হয়), আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার জীবনটাও নষ্ট হ'তে পারে, আমার কি উচিত নয় আমার হাত থেকে তাকে বাঁচানো ? তার জন্য, আর নিজের জন্যও আমাকে চ'লে যেতে হবে। পাছে আবার অবনীকে দেখে আমার মনের জোর ক'মে যায়, তাই আর দেরি করলাম না আমি, তক্তাপোশের তলায় খুঁজে পীসবোর্ডের একটা বাক্স পেলাম, তাতে গুছিয়ে নিলাম শাড়ি, জামা, তোয়ালে, চুলের কাঁটা চুলের ফিতে ইত্যাদি — যা-কিছু অবনী সেদিন নিয়ে এসেছিলো।

> 'আমি চ'লে যাচ্ছি, আপনি আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না। আপনার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ তা মুখে ব'লে কী হবে।
>
> পাঁচটি টাকা নিয়ে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিলাম, চাবিটাকে চিঠির মধ্যে জড়িয়ে হুড়কোর ফাঁকে গুঁজে নেমে এলাম রাস্তায়। তখন পড়ন্ত বেলা ; শীতের শেষে মাঝে-মাঝে যেমন হয়, আকাশটা মেঘলামতো, বাতাস মন-কেমন-করা। বেশ লাগছিলো পিঠের ওপর রোদ্দুরটা — পর-পর তিনটে বাস্ চ'লে গেলো, ইচ্ছে ক'রেই ছেড়ে দিলাম। আর-একটা এসে দাঁড়ালো, আমি উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কে ডেকে উঠলো — 'কমলা !' আমার অবাক লাগলো রাস্তায় আমার নাম শুনে — কলকাতায় কেউ যে আমার চেনা আছে, তা যেন মনে পড়লো না। ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখলাম

তাকে চিনতে একটুক্ষণ দেরি হ'লো আমার। একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আরে! দোলন!' 'বা-ব্বাঃ! কতকাল পর দেখা বল তো!' দোলন এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো, একবার চোখ বুলিয়ে গেলো আমার ওপর দিয়ে, আমি বুঝলাম আমার পরনের শস্তা শাড়িটা তাব নজর এড়ায়নি। মনে একটু আঘাত লাগলো আমার, এ-রকম শাড়িতে সেও অনেক ঘোরাঘুরি করেছে তা কি সে ভুলে গেলো? সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'তুই বুঝি শাড়ি কিনতে বেরিয়েছিলি?' 'হ্যাঁ, কিনলুম কয়েকটা,' শাড়ির দোকানের নাম-ছাপানো বাক্সটাকে একটু আদর করলো দোলন। 'তোর হাতে ঐ বাক্সটা কিসের? কোথায় যাচ্ছিলি?' 'এই — একটু কাজ আছে ও-পাড়ায়। তা তুই কেমন আছিস বল। বেশ ভালোই তো দেখছি।' দোলন একটু টেনে-টেনে বললো, 'হ্যাঁ, ভালো আছি — খু-ব ভালো।' একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ আবার বললো, 'আয় না আমার সঙ্গে একটু চা খাবি।' 'আমার সময় নেই, দোলন। আমাকে শ্যামবাজার যেতে হবে।' 'আয়, আয়,' দোলন আমাকে হাতে ধ'রে টানলো। 'আমি তোকে এস্‌প্লানেড অবধি ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবো, কতটুকুই বা সময় লাগবে এক পেয়ালা চা খেতে। আয়।' সত্যি বলতে, দোলনকে দেখে আমার এমন চমক লেগেছিলো যে মনের সেই অবস্থাতেও কৌতূহল সামলাতে পারলাম না, এলাম তার সঙ্গে বসুশ্রী সিনেমার দোতলার রেস্তোরাঁয়। কোণের একটি নিরিবিলি টেবিলে বসলাম দু-জনে; আমার

মনে পড়লো আমার চুপসে-যাওয়া হাওয়ার বেলুন, ফিল্মে অভিনয় ক'রে স্বাধীন হবার স্বপ্ন। সেই সময়ে, মহালক্ষ্মী স্টুডিওতেই, দোলনের সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা হ'তো আমার — একটা ফিল্মে একই ভিড়ের দৃশ্যে সে আর আমি দাঁড়িয়েছিলুম — একই আশায় দুলছে দু-জনের বুক। আমারই মতো উদ্বাস্তু মেয়ে, এক হিশেবে আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা, কেননা তার আছে মা, বাবা আর চারটি ছোটো-ছোটো ভাই-বোন। যাদবপুরের কোন কলোনিতে একটা চালাঘর তুলে আছে কোনোমতে, বাবা একটা ছোট্ট কারখানায় কেরানিগিরি ক'রে যা পান তাতে এ-বেলা হ'লে ও-বেলা খাওয়া হয় না। সমদুঃখী ছিলাম আমি আর দোলন, তাই অল্প সময়েই বেশ বন্ধুতা হ'য়ে গিয়েছিলো আমাদের; এক-এক দিন সারা দুপুর গল্প ক'রে কাটিয়েছি সে আর আমি, স্টুডিওর কোনো নিরিবিলি কোণে, গাছের তলায় — কিছু করার নেই ব'লেও, ভালো লাগছে ব'লেও। আমাদের ছেলেবেলার কথা বলতাম আমরা — যা স্বপ্ন হ'য়ে গেছে; আর যা বলতাম তাতে আমাদের এখনকার কষ্ট আর দুশ্চিন্তা যেন কিছুক্ষণের জন্য হালকা হ'য়ে যেতো। দোলন বলতো, 'আমিই বাবার বড়ো সন্তান, আমাকেই ছেলের কাজ করতে হবে — যে ক'রে হোক, টেনে তুলতে হবে সংসার। জানিস তো, অনেকেই সিনেমা শুনলে নাক শিঁটকোয়, কিন্তু তারা তো একবেলাও খিদের কষ্ট পায়নি, আর আমি কখনো একটা পুঁচকে অ্যাক্‌ট্রেস হ'তে পারলেও সেই মহোদয়েরা আমার

দর্শন পেলে ধন্য হবেন!' ওর সাহস, উদ্যম, সপ্রতিভতা দেখে আমার মনে প্রশংসা জাগতো ওর জন্য — দেখতেও সুশ্রী, সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, কথাবার্তায় আড়ষ্টতা নেই। আমি ওকে বলতাম, 'ভাবিস না, তুই নিশ্চয়ই স্টার হ'তে পাববি।' কিন্তু হঠাৎ ও মহালক্ষ্মী স্টুডিও থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো, মাঝে-মাঝে আমাব মনে পড়েছে ওর কথা, কিন্তু ওব বাড়ি চিনি না, খোঁজ নেবার উপায় নেই, তাছাড়া নিজেব ধান্দায় সব সময় যে উদ্ব্যস্ত সে অন্যের কথা ভাবাব বেশি সময় পায় না। আজ হঠাৎ দোলনকে দেখতে পেয়ে আমাব মনে হ'লো আমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে। আশ্চর্য বদল দেখছি তার। পরনের শাড়িটা চোখে পড়ার মতো, সাটিনের ব্লাউজ এঁটে বসেছে গায়ের ওপর (দেখেই বোঝা যায় ভালো দর্জি দিয়ে কবানো), চুলের ভোল চটকদার, নখগুলো মিনেব মতো ঝকঝকে, গাল দুটো এমন ধরনের গোলাপি যে তাব নিজের রং ব'লেই ভুল হয়। ওর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, 'দোলন, তুই তাহ'লে বড়ো পার্ট পেয়েছিস? কী-নাম ফিল্মটার?' দোলন উত্তর দিলো, 'না বে, আমি আব সিনেমায় নেই।' 'তবে? বিয়ে কবেছিস? খুব ভালো। খুব সুখের কথা।' 'আমার কথা পবে বলছি। তোর খবর কী, বল। তুই ফিল্মের লাইনে আছিস এখনো?' 'কোথায় আর?' 'কী করছিস তবে?' 'বেঁচে আছি।' আমি হালকা সুরেই বলতে চেয়েছিলাম কথাটা, কিন্তু আমার গলা ক্লান্ত শোনালো, করুণ। 'সেই মাসির বাড়িতেই আছিস?' 'না। আমি এখন—' থামলি

কেন? কোনো গোপন কথা? তা না-বলতে চাস আমি জোর করবো না, কিন্তু — তোকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুই কষ্টে আছিস।' আমি মাথা নিচু করলাম, দোলন তক্ষুনি আবার বললো, 'বল, আমি কি কিছু করতে পারি তোর জন্য? জানিস, আমি তোর কথাই ভাবছিলাম ক-দিন ধ'রে, কী ভাগ্যে আজ দেখা হ'য়ে গেলো।' তার এই সহানুভূতির সুরে আমার চোখে প্রায় জল এলো, বললাম, 'আমারও ভাগ্য, দোলন। শোন, তুই কোনো আশ্রমের ঠিকানা জানিস — যেখানে উদ্বাস্তু মেয়েরা থাকতে পায়?' 'আশ্রম?' ঠোঁটের কোণে হাসলো দোলন, 'নিজেকে জ্যান্ত কবর দিতে চাস?' 'তা কেন?' আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করলাম, 'অন্তত একটা ভদ্র জীবন তো।' 'আর ভদ্র!' ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেললো দোলন, 'ঢের ঢের ভদ্রলোক দেখেছি, কমলা, আমার আর ওতে চিত্ত নেই।' 'কিন্তু আর কোনো উপায় যদি না থাকে—' 'উপায় কেন থাকবে না? ক'রে নিলেই আছে।' আস্তে, অনেকটা আপন মনে কথাটা বললো দোলন, আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে ব'লে উঠলাম, 'কী-উপায়? বল আমাকে, কী-উপায়?' 'বলছি। আগে আমার একটা কথা শোন। আমার হাতে টাকা আছে, তোর দরকার? নিবি?' দোলন ব্যাগের মুখ খুলতে গেলো, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'পাগল নাকি! আমি তোর টাকা নেবো কেন?' 'নিলিই বা। দোষ কী? আমি কি তোকে দিতে পারি না কিছু? আচ্ছা, একটা শাড়ি উপহার দিচ্ছি তোকে — না-নিলে রাগ করবো কিন্তু।'

নতুন-কেনা শাড়ির বাক্সটার ডালা তুললো সে, পর-পর তিনখানা শাড়ির কোণ তুলে বললো, 'দ্যাখ, কোনটা তোর পছন্দ। এই কটকি শাড়িটা? না, নীলরঙের নাইলনটা বরং নে তুই, তোকে মানাবে।' আমি অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালাম, সে চায়ের পেয়ালায় মুখ নামালো। একটু পরে বললো, 'নিবি না তাহ'লে? আমার কিন্তু ধারণা ছিলো তুই আমাকে বন্ধু ব'লে ভাবিস?' আমি আবেগের ঝোঁকে ব'লে উঠলাম, 'দোলন, আমার সমস্যা অনেক বড়ো, একখানা শাড়ি বা কিছু টাকায় তার সমাধান হয় না।' 'কারোরই হয় না, কমলা। টাকা ফুরোয়, শাড়ি ছিঁড়ে যায়, অনবরত চাই ওগুলো। তার ব্যবস্থা আমি তোকে ক'রে দিতে পারি — তুই যদি রাজি থাকিস।' 'এর মধ্যে আবার রাজি-অরাজির কথা ওঠে নাকি? বল, কী করতে হবে।' আমার হৃৎপিণ্ড আশায় দুলে উঠলো, দোলনের উত্তর শোনার জন্য তার চোখে চোখ রাখলাম। তার চোখ দুটি সরু হ'তে-হ'তে বুজে এলো প্রায়, একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো সে, তারপর ফিশফিশে গলায় বললো, 'আমি যা করছি, তা-ই।' তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন ভয় করলো আমার, মুখে কথা সরলো না, মনে একটা বিকট সন্দেহ উঁকি দিলো, কিন্তু তক্ষুনি সেটাকে সবলে ঠেলে দিলাম। 'অভিনয়, কমলা, এটাও এক ধরনের অভিনয়,' নিচু গলায়, ফিশফিশ ক'রে বলতে লাগলো দোলন। 'আমাকে ওরা বলেছিলো কোন সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য ফিল্ম তৈরি করছে, আমাকে স্নানের টবে বেশ কিছুটা গা খুলে ব'সে

থাকতে হবে, অঙ্গভঙ্গি ক'রে বোঝাতে হবে আমি ঐ সাবান মেখে স্বর্গসুখ অনুভব করছি — বেশিক্ষণ না, মাত্রই দু-তিন মিনিট। পাঁচশো টাকা দেবে বলেছিলো, আগাম দিয়েছিলো দু-শো। কিন্তু —' দোলন চায়ে গলা ভিজিয়ে নিলো, 'কিন্তু সেই ফিল্মে ওরা আমাকে নেয়নি শেষ পর্যন্ত, তবে আমাকে ব্যবহার করেছিলো — অন্যভাবে। সেখানেই শুরু।' আমার গলা চিরে আওয়াজ বেরোলো, 'দোলন, তুমি বলছো কী!' 'আস্তে!' আমার কাঁধে টোকা দিলো দোলন, 'ওদিকে লোক আছে। তা সেই দু-শো টাকা খুব কাজে লেগে গিয়েছিলো, ছোটো ভাইটার টাইফয়েড চলেছে তখন। আর তারপর থেকে —' দোলন থামলো, মোটা গলায় হাসলো একটু। 'হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেলো জানিস, আমি বুঝলাম যে এই একটা শরীর ছাড়া আমার আর-কিছু নেই — এই আমার সম্পদ, সম্পত্তি, মূলধন। জানতাম না এমন তামাশা চলে কলকাতায়, জানতাম না টাকা রোজগার এত সহজ! জানিস, আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলেও রাত কাটিয়েছি — আঃ, কী বিছানা, কী আরাম! বাড়িতে বলেছি, আমি একটা সমাজ-সেবার কাজ পেয়েছি, কাজের কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই, মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। নিশ্চয়ই ওঁরা অন্য কিছু সন্দেহ করেন, কিন্তু — বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, আর সংসারের হাল তো ফিরে যাছে। বাবা বাস্ থেকে প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙে-ছিলেন, সারতে পুরো তিনমাস লাগলো, ফ্যাক্টরি থেকে মাইনে দিচ্ছে না — কী যে অবস্থা! যে টাকা আনছে, তার কথায়

বিশ্বাস করা খুব সহজ হ'য়ে যায় ও-রকম সময়ে। তা এক ধরনের সমাজ-সেবা বইকি — আনন্দ-বিতরণ, সুখ, ফুর্তি, আমোদের কারবার — তুই যা ইচ্ছে বলতে পারিস, কিন্তু এও তো চায় লোকেরা, আর এর মধ্যে কোনো চুরি-জোচ্চোরি নেই, কারো কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না, আমারও গায়ে ফোস্কা পড়ছে না, এদিকে আমার ভাইবোনগুলোর জামা-কাপড় হয়েছে, পড়াশুনো চলছে, দুধ ডিম মাছ মাংসের চেহারা দেখছি আমরা, আস্তে-আস্তে বাড়িটাও সারাই করিয়ে নেবো। তুই অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন, কমলা? তোর ঘেন্না করছে আমাকে? কিন্তু আমার তাতে কী এসে যায়, বল। ধর, তুই আর আমি একসঙ্গে কোনো বিয়ে-বাড়িতে গিয়েছি — সেখানে আমার দিকেই অনেক বেশি মনোযোগ দেবে লোকেরা, যদিও তুই খুব ভালো হ'তে পারিস আর আমি হ'তে পারি যারে বলে "খারাপ মেয়ে"। সবই সাজগোজ, বাইরের চটক, ভেতরটা কেউ দেখতে পায় না। কাজটা কিন্তু শক্ত নয় মোটেও — যা একটু কষ্ট ঐ প্রথম ক-দিন, তখন দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে প'ড়ে থাকলেই হ'লো, কয়েক মিনিটেরই তো ব্যাপার। আর তারপর একবার অভ্যেস হ'য়ে গেলে দিব্যি সোজা। খদ্দেরেরা বেশির ভাগ হ'লো আধ-বয়সী, বাড়িতে বৌ ছেলেপুলে সবই আছে, কিন্তু রোজগার আর সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এখন ক্লান্ত, একটু রং চায়, নেশা চায়, কিন্তু ব্যামোর ভয়ে অলিতে-গলিতে যেতে নারাজ — এরা প্রায়ই বেশি মদ খেয়ে নিষ্কর্মা হ'য়ে

পড়ে, মস্ত বাঁচোয়া! আর আছে কিছু ছেলে-ছোকরা, নেহাৎই আর সামলাতে পারছে না নিজেকে, তারা কেউ "অভিজ্ঞতা অর্জন" করতে চায়, কেউ বন্ধুদের দেখাতে চায় সে কত ওস্তাদ, কেউ বা আসল ভুলে কাব্যি-কথা শোনাতে শুরু করে — বেচারাদের ফাঁকি দেবার মতো সহজ আর-কিছু নেই। আর কখনো কোনো ষাট-পেরোনো বুড়ো, আসলের বালাই আর নেই তাদের — শুধু চোখ দিয়ে গেলে, হাত দিয়ে চটকায় — খুব নিরাপদ!' খড়খড়ে গলায় একটু হেসে উঠলো দোলন, তারপর আবার বলতে লাগলো, 'মাঝে-মাঝে দু-একটা ভালুক-উল্লুক জুটে না যায় তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই যাকে বলা যায় "উঁচু দরের" — কেউ কোম্পানির খরচে জাপান যাচ্ছে পশু, কেউ তিনটে মোটর গাড়ির মালিক। এরা তোর গলা কাটবে না, ঘুমিয়ে পড়লে গয়নাগাঁটি চুরি করবে না — বরং কয়েক পাত্র পেটে পড়ার পর অনেক মন-গলানো বাক্যি শোনাবে। যদি একটু দূরে থেকে, বাইরে থেকে দেখা যায় ব্যাপারটাকে, যদি ধ'রে নেয়া যায় এর মধ্যে আমি নেই, ঐ মেয়েটা অন্য একজন, তাহ'লে বেশ মজাও লাগে, জানিস — কত রকম বোকামি, ন্যাকামি, হাম্বড়া ভাবের তলায় অল্প-পরানী কিপটেমিই বা কত! আর তাছাড়া, যেটা আসল ব্যাপার, তাতে তো আর বিয়ের সঙ্গে তফাৎ নেই, এমন তো নয় যে স্বামী-স্ত্রীরা বাতাস হ'য়ে এ ওর মধ্যে মিশে যায়, হাজারবার সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ালেও নোংরা জিনিশটা নোংরাই থাকে।

তবে — হ্যাঁ — শেষ পর্যন্ত বিয়েই ভালো, একমেবাদ্বিতীয়ম্-এ সাংসারিক সুবিধে আছে। "আমি ভাবছি কী, জানিস, আমার বয়স এই একুশ হ'লো, আর বছর পাঁচেক করবো এই কাজ, তার মধ্যে আমার পরের বোনটির বিয়ে দিয়ে দেবো — এখন থেকেই টাকা জমাচ্ছি তার জন্য — ভাই দু-জন পাশ-টাশ ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে — সবচেয়ে ছোটো বোনটিকে তারাই চালাতে পারবে তখন। আর তখন আমি দেখে-শুনে বিয়ে করবো কাউকে, একটি ঠাণ্ডা-মাথার আধ-বয়সী বাঁধা-চাকুরে ভদ্রলোক — দোজবর, অবাঙালি, কিছুতেই আপত্তি নেই আমার — ব্যস, যাকে বলে সুখের সমাপ্তি, নববধূ সেজে বাসর-ঘরে গল্প শেষ। সব মুছে যাবে তখন, মাঝখানকার এই কয়েকটা বছর মুছে যাবে। কেউ জানবে না, আমিও ভুলে যাবো। কী বলিস, ভালো ভাবিনি?' চায়ের পেয়ালা শেষ চুমুক দিয়ে মুখ তুললো দোলন, আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। 'কিছু বলছিস না? আমি এতক্ষণ ধ'রে কথা বললাম, আর তুই কিছু বলছিস না?'

আমি ঢোঁক গিললাম। আমার গা কাঁপছিলো, গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো।

'কী? আমার দিকে তাকাবিও না? এত ঘেন্না? কিন্তু কেন? আমি কি আমার সারা পরিবারকে টেনে তুলছি না? আমারই চেষ্টায় কি মানুষ হচ্ছে না ভাইবোনগুলো? অনেক কষ্টের পর মা-বাবা একটু আরাম পেয়েছেন, তা কি আমারই জন্য নয়? তুই কি বলবি এর চাইতে ভিক্ষে করা ভালো?

দড়ি-কলসি ভালো? কিন্তু কেন? আমি তো আমার মা-বাবা ভাইবোনেদের ভালোবাসি, তাদেরই জন্য বেঁচে থাকতে হবে আমাকে — আর যদি এটা খারাপ হয়, পাপ হয়, সেই পাপও তো আমারই একলার, যদি এটাকে জাহান্নাম বলিস তার আঁচ তো ওদের গায়ে লাগবে না। আর তাছাড়া, জাহান্নামই বা কেন — আমার এই নিজের জীবন, সেটা কি কিছু নয়, সেটা কি একটা ফুটো পয়সার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার জিনিশ? আমার কি প্রাণ নেই, মন নেই, আত্মা নেই, আমারও কি সুখের ইচ্ছে নেই? আমি বাঁচতে চাই, কমলা, কিন্তু পোকার মতো নয়, মানুষের মতো, আমি মাথা তুলতে চাই, মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই — আর যা না-থাকলে কিছুতেই মাথা তোলা যায় না, আজ সেই টাকা আমার ব্যাগ-ভর্তি — এই দ্যাখ, চুরি নয়, জোচ্চুরি নয়, আমার স্বাধীন উপার্জন!'

শেষ কথাগুলো বলতে-বলতে দোলনের গলা ভেঙে এলো, অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেলো ওপরের ঠোঁট তার সুন্দর মুখটিতে এমন দু-একটা রেখা পড়লো, যা কান্নার মতো। কিন্তু এবারেও আমার মুখে কোনো কথা ফুটলো না, কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটলো। বড়ো একটা নিশ্বাস ফেললো দোলন, কম্প্যাক্ট খুলে আয়নায় একটু দেখলো নিজেকে, আস্তে-আস্তে মুখে পাউডার বুলোলো, তারপর মোটা গলায় বললো, 'চলি তাহ'লে। তুই আমার কোনো কথাই রাখলি না, তবু — আমি তোর ভালো চাই ব'লেই আর-একবার

বলছি, ভেবে দেখিস। তোর ঠিকানাটা দিবি নাকি আমাকে? না? আচ্ছা, আমারটা রাখ অন্তত — আর একটা ফোন-নম্বরও দিচ্ছি, কখনো কোনো সাংঘাতিক দরকার হ'লে আমাকে মনে করিস।' দোলন আমার নিঃসাড় হাতের মুঠোয় এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিলো, দু-জনে উঠে দাঁড়ালাম। 'আমার সঙ্গে আসবি নাকি এস্‌প্লানেড পর্যন্ত, না তাতেও আপত্তি?' আমি আস্তে তার হাত ধ'রে বললাম, 'দোলন, আমি আজ আর শ্যামবাজারে যাবো না, অন্য একটা কথা ম'নে প'ড়ে গেলো।' 'তার মানে — আমাকে এড়াতে চাস? বেশ।' আমাকে পেছনে ফেলে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলো দোলন, আমি ফুটপাতে এসে তাকে আর দেখতে পেলাম না। আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হ'য়ে আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম, দরজার হুড়কো থেকে বের ক'রে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম সেই চিঠি, যা আধ ঘণ্টা আগে আমিই লিখেছিলাম; — ভেতরে দেখলাম চেনা ঘর, চেনা জিনিশপত্র, মনে হ'লো বহুদিন পর নিজের বাড়িতে ফিরেছি।

আমার মনে নতুন ক'রে তোলপাড় শুরু হ'লো। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি দোলনকে — তার মুখ, পোশাক, ঠোঁটের ভঙ্গি, চোখের তাকানো। তার কথাগুলি ঘুরছে আমার মগজের মধ্যে — বার-বার, বার-বার। আমি কি সত্যি ঘৃণা করেছিলাম তাকে? কিন্তু কই, আমি তো রাগের ঝোঁকে উঠে আসিনি, শেষ পর্যন্ত বলতে দিয়েছিলাম তাকে, শুনেছিলাম। আমি কি ভয় পেয়েছিলাম তার কথা শুনে,

তার জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম? কিন্তু কই, আমি তো একবারও বলিনি, 'দোলন, তোর পায়ে পড়ি, ঐ জঘন্য জীবন ছেড়ে দে, ফিরে আয়।' সে যে-পথে গেছে তা যে কত ভীষণ, কত কুৎসিত, তা তো আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি, তার সামনে তুলে ধরিনি এমন কোনো আশা, এমন কোনো ছবি, যাতে তার মনের ভাব বদলে যেতে পারে। একটা ভালো মেয়ে, আমার বন্ধু, আমার চোখের সামনে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এ আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছিলাম। কেন? এইজন্যে, যে আমি প্রথমে যদিও স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম, তবু, সে যত বলছে, আমি যেন ততই মেনে নিচ্ছি তার কথা, মনে-মনে অক্ষরে-অক্ষরে একমত হচ্ছি তার সঙ্গে। আশ্চর্য তার শক্তি, সাহস, মনের জোর — এমনি মনে হচ্ছিলো আমার, তার তুলনায় আমি যেন ভিতু, বোকা, দুর্বল। তার উপহার আমি হেলায় ঠেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে আমার জন্য কিছু করতে চাচ্ছে, আর করার মতো ক্ষমতাও যে আজ আছ তার, এ-জন্যে মনে-মনে তাকে প্রশংসা না-ক'রে পারিনি। 'আমার কি মন নেই, প্রাণ নেই, আত্মা নেই, সুখের ইচ্ছে নেই? আমি বাঁচতে চাই, পোকার মতো নয়, মানুষের মতো!' তার এই কথাগুলি কাঁপিয়ে দিয়েছিলো আমাকে, যেন আমারই মনের তলাকার কথা টেনে নিয়ে আরো জোরালোভাবে, সুন্দরভাবে বলছে সে। দোলন যদি দোষী হয়, আমিও তো তা-ই। ওরই মতো অবস্থা প্রায় হ'তে চলেছিলো আমার — সেদিন রাত্রে, যখন আমার পায়ের তলায় রাস্তা ছাড়া আর-কিছু ছিলো না।

ধরা যাক তখন যদি অম্বু — বা ওরই মতো অন্য কেউ এসে দাঁড়াতো আমি কি পারতুম তাকে ফেরাতে? আমিও কি মনে-মনে ভাবিনি — যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে সে মেয়ে নয়, মানুষও নয়, কিছুতেই কিছু এসে যায় না তার? ভাগ্য — নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলাম। — বেঁচে গেলাম? কিন্তু অবনীর সঙ্গে যে-ভাবে আছি সেটাকেই কি ভালো বলবে লোকেরা? কিন্তু কারা সেই অচেনা অদৃশ্য নাম-না-জানা লোকেরা, যাদের চোখে 'ভালো' হবার জন্য আমি নিজেকে জ্যান্ত কবর দেবো অনাথ-আশ্রমে? না, আমি চাই না ভিখিরির জীবন, জলে ডুবে মরতেও চাই না। দোলনের প্রতিটি কথা সত্য — সত্য— অথচ মর্মান্তিক, অথচ অসহ্য। আর তক্ষুনি, সেই চায়ের টেবিলে ব'সে-ব'সেই, দোলনের কথ শেষ হবাব আগেই, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার ভবিষ্যৎ। যদি আজ বেরিয়ে যাই, সত্যি যদি ছেড়ে দিই অবনীকে, তাহ'লে — কী হবে কে জানে। তাহ'লে আরো অনেক লাথি-গুঁতো খেয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত দোলনেরই শরণাপন্ন হ'তে হবে আমাকে। আর নয়তো — নয়তো — হ্যাঁ, সেটাই ভালো, অনেকগুলোর চাইতে অনেক ভালো একজন পুরুষ। অবনী ছাড়া কেউ নেই আমার, অবনীর সঙ্গেই আমার নিজের জীবনটাকে জড়াতে হবে। তাকে আমি ছাড়বো না, তাকে আমি ধ'রে থাকবো, তাকে আমি — না, এখন আর বলতে লজ্জা নেই আমার — তাকে আমি ভালোবেসেছি।

সন্ধে হ'য়ে এলো, গুরুগুরু মেঘের শব্দ শুনলাম, জানলা দিয়ে দেখলাম বিদ্যুতের চমক। একটু পরে বৃষ্টি নামলো ঝর্ঝর শব্দে। জোর নেমেছে, বর্ষাকালের মতো, বাতাসে ঠকঠক করছে খড়খড়িগুলো। আমি জানলা বন্ধ ক'রে আলো জ্বাললাম, হঠাৎ বড্ড ফাঁকা মনে হ'লো বাড়িটা। এমনি সময়ে অবনী ফেরে আজকাল, আগে দেরি করতো, কিন্তু আমি যেদিন থেকে রান্না করছি সেদিন থেকে তারও নিয়মকানুন বদলেছে। 'আগে', 'আজকাল' ; ক-দিনেরই বা ব্যাপার। বারো—চোদ্দ—না, এরই মধ্যে তিন সপ্তাহ হ'য়ে গেলো। মাত্র তিন সপ্তাহ, কিন্তু মনে হচ্ছে কতকাল। এবারে ফিরে এলেই পারে অবনী, আমার ভালো লাগছে না। সে কি বৃষ্টিতে আটকে গেলো কোথাও? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে? এই একটানা একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে একা লাগছে আমার। আমি অনেকদিন ধ'রেই একলা, কিন্তু আজকের একা লাগাটা অন্য রকম। বৃষ্টি থামলো, আমি ঝোলানো বারান্দাটিতে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা থই-থই করছে জলে, সারি-সারি ট্রাম অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলের ওপর দিয়ে শপ্‌শপ্‌ শব্দে এক-একটা বাস্‌ এসে দাঁড়াচ্ছে, তাতে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে মানুষগুলো। নিশ্চয়ই ওরই একটা থেকে এক্ষুনি নামবে অবনী? কত লোক নামছে, কিন্তু তারা কেউ অবনী নয়। ঘরে, বারান্দায়, কখনো বসা, কখনো পাইচারি— অদ্ভুত মানুষ, এত রাত অবধি করছে কী? 'কাজ, আড্ডা — আড্ডা, কাজ।' আড্ডাই বেশি বোধহয়? গল্পে-গুজবে মেতে

গেলে কাউকে আর মনে থাকে না। না কি কোনো বিপদ হ'লো? বাস্-এ উঠতে গিয়ে প'ড়ে গেলো? রোজ কত কী হচ্ছে কলকাতায় — ট্যাক্সি উল্টে যাচ্ছে, বাস্-এ ট্রামে ধাক্কা, রাস্তায় চাপাও পড়ে মাঝে-মাঝে — আর বৃষ্টির পরে তো পাগলের মতো ছোটে সবাই। ভাবতে-ভাবতে যেন দম আটকে এলো আমার, মনে-মনে বললাম, 'হে ভগবান, আর-কিছু চাই না, অবনী যেন ফিরে আসে।' আর তারপর, অবশেষে, যেন অনন্তকাল পরে, দরজায় সেই তিনটি চেনা টোকা। তাকে দেখামাত্র আমি ব'লে উঠলাম, 'বেশ লোক! এত দেরি!' সে যেন একটু অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো, আস্তে বললো, 'দেরি হয়েছে নাকি? মাত্র সাড়ে-ন'টা তো। আপনার কি ভয় করছিলো?' 'হ্যাঁ, আমি তো আমারই জন্য ভয় পাচ্ছিলাম!' অবনী একটু গম্ভীর হ'লো আমার কথা শুনে, আমার মনে পড়লো তার সঙ্গে আমার ও-রকম সুরে কথা বলার মতো সম্পর্ক নয়। কিন্তু না — এখন আর নিজেকে লুকিয়ে রাখার মানে হয় না, মনে-মনে আমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।' টেবিলের ওপর একটা কাগজের বাক্স রেখে অবনী হালকা গলায় বললো, 'চীনে রেস্তোরাঁ থেকে ফ্রাইড রাইস নিয়ে এসেছি, এখনো গরম আছে, আগে খেয়ে নেবেন নাকি?' 'আমার কথাটা শুনবেন দয়া ক'রে?' একটু চুপ ক'রে থেকে অবনী বললো, 'এখানে আপনি আর থাকতে চান না — এই তো?' 'না, তা নয়।

কিন্তু আমি তো এখানে চিরজীবন থাকতে পারবো না।' কী ক'রে জানলেন, পারবেন না?' 'তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? আপনি কি ছেলেমানুষ?' 'আমি কিন্তু অন্য রকম ভাবছিলাম।' 'অন্য রকম মানে? কী-রকম?' 'ভাবছিলাম — ভাবছিলাম —' অবনী থেমে গেলো হঠাৎ, আমার দিকে তাকালো, আমি তার চোখে দেখলাম বিশ্বাস আর সরলতা। খুব নিচু গলায় বললো, 'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' আস্তে হাত রাখলো আমার কাঁধের ওপর, আর আমি যেন নিজের অজান্তে এগিয়ে এলাম তার দিকে — আমার দুঃখময় অতীত, অনিশ্চিত বর্তমান, মাসিমা, অম্বু, আর সব-শেষে তার ত্যাগ, সাহস, উজ্জ্বলতা নিয়ে ভয়-পাওয়ানো দোলন — সব যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে এলো আমার জীবনের এই একমাত্র সম্ভবপর আশ্রয়ের দিকে, আমি অবনীর বুকে মুখ গুঁজে কান্নার বেগে কেঁপে উঠলাম। সে-রাতে আমাদের দুই বিছানা এক হ'য়ে গেলো।

৮

শান্তি পেয়েছিলে কমলা — সেই রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো যেন। ভাসছিলো, ডুবে যাচ্ছিলো, আর হঠাৎ — এই নৌকো, এই শুকনো ডাঙা, এই সবুজ নরম পদ্মার চর। শুরুতে যা ছিলো দয়া, মহত্ত্ব,

এখন তা হাওয়ার মতো সহজ। হাওয়ার মতো, রোদের মতো, খিদের সময় ডাল-ভাতের মতো। সেটা যে ভালো, তা বুঝিয়ে দিতে হয় না। দয়া বিশ্রী; যে নেয় তার মন ছোটো হ'য়ে যায়, যে দেয় সে দেমাকে ফুলে ওঠে। কিছু বিনিময় চাই জীবনে, নিলে কিছু দিতেও হয়, এখানেই আলো-হাওয়ার সঙ্গে তফাৎ। একবার লটারিতে একটা আশ্চর্য উপহার উঠে আসতে পারে, কিন্তু তারপর উপার্জন করা চাই। তার যা আছে সে তা-ই দিয়েছে, আর তাকে মাথা নিচু ক'রে থাকতে হবে না।

হয়তো ব্যাপারটা আসলে তা-ই, আজকালকার উপন্যাসে যাকে 'প্রেমে পড়া' বলে। প্রেম: যেন একটি গোলগাল নধর ফল, কোনো গাছের উঁচু ডালে ঝুলে আছে, আঁকশি দিয়ে পেড়ে ফেললেই হ'লো। সত্যি কি আছে 'প্রেম' ব'লে কিছু, কোনো-কোনো উপন্যাসে যেমন ক'রে লেখে সে-রকম সত্যি কি হয় কখনো? না কি সবই আসলে শরীরের উশকোনি? এই যে ঘরে-ঘরে পাতানো বিয়ে হচ্ছে — দুটো মানুষ, কেউ কাউকে চেনে না, আগে চোখেও দ্যাখেনি কোনোদিন, ধুম ক'রে এক বিছানায় শুইয়ে দিলেই হ'লো, তারপর ভগবানের কাজ ভগবান করেন। তবে, হ্যাঁ — ভালো লাগা ব'লে একটা ব্যাপার আছে, সেটা খাঁটি, চিনতে ভুল হয় না। তা-ই হয়েছিলো আমাদের। ভালো লাগছিলো — আমার ওকে, আমাকেও ওর, দিনে-দিনে একটু-একটু বেশি। চোখে-চোখে, ছোটো-ছোটো কথায়, বিনি কথায়; দূরত্ব বজায় রেখে চলা

শক্ত হ'য়ে উঠছিলো ক্রমশ। আমি যে চ'লে যেতে চেয়েছিলাম তা এইজন্যই। কতগুলো নিয়ম গেঁথে দেয়া হয় আমাদের মনের মধ্যে, কতগুলো ভালো-মন্দের ধারণা নিয়ে আমরা বড়ো হ'য়ে উঠি — অনেক বিপদ থেকে তা বাঁচায় আমাদের, আবার কখনো-কখনো সেগুলোই কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে, তারই জন্যে বিরাট কোনো ভুল ক'রে ফ্যালে কেউ-কেউ। যেমন আমি প্রায় করতে যাচ্ছিলাম সেদিন, যখন অবনীকে ছেড়ে চ'লে যাবার মতো পাগলামি আমার মাথায় ঢুকেছিলো। আমি ফিরে এলাম, আমি অবনীর হাতে তুলে দিলাম নিজেকে; নিয়ম হিশেবে এটা ভালো নয়, কিন্তু সত্যি কি এটা খারাপ? আমি কি শরীর দিয়ে লুব্ধ করেছিলাম অবনীকে, নিজে বাঁচার জন্য? কিন্তু অবনীও তো চেয়েছিলো আমাকে; কেমন আমরা এক মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিলাম আমাদের দু-জনেরই মনের কথা এক। এ-রকম ক'রে চাওয়া কি ভালো নয়? জানি না, আর আজ সে-কথা ভেবেই বা কী হবে, আজ তো সেই চাওয়ার ওপরেই বিয়ের শীলমোহর পড়লো, আমরা পদ্মার চর থেকে উঠে এলাম নিজের দেশে — চোরের মতো চুপি-চুপি নয়, সগৌরবে। আজ জয় হ'লো আমার, যাকে বলে চূড়ান্ত জয়, সেই রাত্রেই এর বীজ বুনেছিলাম আমরা, সেই বৃষ্টি-পড়া শীতের রাত্রে, ন-মাস আগে। তাহ'লে কেন আর আমি নিজেকে দোষ দেবো, আর এই আমার শরীর, যার ওপর অবনী এত আদর বর্ষণ করেছে, সেটাকেই বা দোষী করবো কেন?

সব কথা তোমাকে বলিনি এখনো, অবনী, এর পরে আস্তে-আস্তে বলবো। জানো, আমার মন আবার নতুন ক'রে অশান্ত হয়েছিলো, টালিগঞ্জের বাড়িতে যখন গুছিয়ে বসেছি, আর তোমার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গিতে টের পাচ্ছি যে তুমি আমাকে — ঐ যাকে বলে — ভালোবাসো। কিন্তু 'ভালোবাসা'য় আমার তেমন আস্থা নেই, আমার মন ছোটো। জানো, আমি আঁৎকে উঠেছিলাম যখন শুনলাম তোমাদের পৈতৃক বাড়ি আছে বীডন স্ট্রিটে, তোমার মা-র দশ কাঠা জমি আছে বালিগঞ্জে, তুমি তোমার মায়ের এক ছেলে, তোমার কাকা নামজাদা উকিল, মামা মস্ত ডাক্তার, যাকে বলে 'বড়ো ঘর' তা-ই হ'লে তোমরা। তুমি বেরিয়ে এসেছো কাকার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, যেহেতু তিনি চেয়েছিলেন তুমি আইন পাশ ক'রে তোমার বাবার মতো মুন্সেফিতে ঢোকো, বা কাকারই হেপাজতে ওকালতিতে নাম লেখাও, আর তুমি চাইলে আর্টিস্ট হ'তে - আর্টিস্ট মানে ছবি-আঁকিয়ে, রেডিওর গাইয়ে নয়, সিনেমার অ্যাক্টর নয়। একদিনে শুনিনি সব, টুকরো-টুকরো ক'রে কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়েছিলো তোমার মুখ দিয়ে — খানিকটা আমারই পিড়াপিড়িতে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেননা তোমার বাড়ির অবস্থা যে রমরমে তা আমাকে জানাতে কেমন লজ্জা তোমার। সুখবর, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পক্ষে সত্যি কি তা-ই? জানো, আমি লক্ষ্মী কালী মা-দুর্গার পায়ে হাজার-হাজার পেন্নাম ঠুকতাম, যদি তুমি হ'তে আমারই মতো বাতাসে-ওড়া

খড়কুটো, তিন কুলে যার কেউ নেই। আমি চালাক, আমি স্বার্থপর, আমি কুচিন্তা ঠেকাতে পারিনি, বিশ্বাস করিনি তোমাকে — যে-তুমি আমার জন্য সব করলে। 'অবনী সুখের সংসারে মানুষ হয়েছে, এই গরিবিয়ানা আর কতদিন সহ্য হবে তার?' ও-সব অল্প বয়সের জেদ বড়ো ঠুনকো, ধোপে টেকে না। আপন কাকা, ও-বাড়িতেই মানুষ, তাঁরাই বা আর কতকাল রাগ ক'রে থাকবেন? মা-র মনে দাগা দেবে আর কতকাল? আর কতকালই বা তার ভালো লাগবে আমাকে, আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়েকে? হয়তো আমিও তার জেদেরই একটা অংশ, সে যে তার বাড়ির লোকেদের কতদূর পর্যন্ত অমান্য করে, তারই একটা ঘোষণা। পরোপকারে শুরু, অরুচিতে শেষ: সবই হয়তো বড়োলোকের ছেলের খেয়াল, বিধবা মা-র আদুরে ছেলের চড়ুইভাতি। এই ব্যাপারটা ওর আত্মীয়েরা কি আর টের না পাবেন। তারপর? তাঁদের তুলনায় আমি তো একটা পোকার মতো, চাইলে আমাকে চোখের পলকে উচ্ছেদ ক'রে দেবেন তাঁরা। বা হয়তো তার দরকারও হবে না, হয়তো অবনীরই লজ্জা করবে একদিন, আমাকে ছেড়ে দেবে হঠাৎ, কিছু না-ব'লে, ফিরে যাবে গুটিগুটি পায়ে বীডন স্ট্রিটে, যেখানে তাব বাড়ি, তার শেকড়। এর চেয়ে সহজ আর কী হ'তে পারে, সত্যি তো তার আমার কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' — এমনি আমি ভাবি মনে-মনে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভুলে যাই, কিন্তু তুমি যখন

বাড়ি থাকো না তখনই আমার মনে প'ড়ে যায় আসলে আমি কত অসহায় এখনো — যদি তুমি কাজে বেরিয়ে এখানে আর ফিরে না আসো, কখনো আর ফিরে না আসো, তাহ'লেও আমার কিছুই করার নেই। একটু-একটু ক'রে কথা তুলি, বলি, তোমাকে দিয়ে বলাই, সুকৌশলে, আড়চোখে তোমার মুখের ভাব লক্ষ ক'রে-ক'রে। আমি বাজিয়ে নিচ্ছি তোমাকে, যাচাই ক'রে নিচ্ছি, তুমি বুঝতে পারো না। আমি বিয়ের কথা তুললে তুমি বলো, 'এই আমরা যে-ভাবে আছি, একসঙ্গে, এক হ'য়ে, অথচ মন্ত্র প'ড়ে সাক্ষী ডেকে কোনো দেখানোপনা করিনি — এটা বিয়ের চেয়েও ভালো, অনেক খাঁটি।' আমি হাসি মনে-মনে, আবার ভয়ও পাই। কী ছেলেমানুষি! সবই হ'তে পারছে শুধু বিয়ের নমো-নমোটুকুই বাদ, সবচেয়ে বেশি দেখানোপনা তো এটাই। আমি তার মনের তলায় ছিপ ফেলি — 'তুমি কি কখনোই বিয়ে করবে না?' 'তা করবো না কেন, আগে অন্য দিকগুলো সামলে নিই তো।' আমি চতুরভাবে বলি, 'নিশ্চয়ই তুমি সুন্দরী বৌ চাইবে, অন্তত বি. এ. পাশ, গান জানে? তোমার মা মেয়ে দেখছেন না?' 'ছি! ও-ধরনের বিশ্রী কথা আর বলবে না, আমি বারণ ক'রে দিচ্ছি।' 'বিশ্রী কেন? বৌ হ'লো সারা জীবনের সঙ্গী, তাই বেশ ভেবে-চিন্তে—' 'আমার সারা জীবনের সঙ্গী আমার ঠিক করা আছে, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না!' অবনীর ঠোঁটের হাসি দেখে আমার বুকের মধ্যে ছলছল ক'রে ওঠে, কিন্তু বিলকুল

ন্যাকা সেজে বলি, 'কে সে? কেমন দেখতে? তার নাম বলো না।' — আর তখন অবনী অন্য উপায়ে বন্ধ ক'রে দেয় আমার মুখ, আর অমনি ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দেয় কে তার মনোনীতা পাত্রী। কিন্তু তা-ই যদি, তাহ'লে দেরি কেন? মাঝে-মাঝে ভাবি, হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে যায় আমার, তাহ'লে তো অবনী বাধ্য হবে বিয়ে করতে — অন্তত সন্তানের জন্য, তাছাড়া বাচ্চাকাচ্চা না-হ'লে কি ভালো লাগে সত্যি, আমার বয়সও তো পঁচিশ হ'লো প্রায়। কিন্তু না — সেখানেও অবনীর ছেলেমানুষি জেদ, সে এখনই সন্তান চায় না, সে ঠেকিয়ে রাখছে আমার মা হবার দিন — মাসের পর মাস। আগে রোজগার, ভালো ফ্ল্যাট, নানান আয়োজন, আগে সে দেখিয়ে দেবে কাকাকে যে সে অপদার্থ নয়, তিনি দেখবেন কাগজে-কাগজে তার ছবির সুখ্যাতি: তারপর বিয়ে, তারপর সন্তান। 'এই বস্তির মধ্যে কি একটা নতুন মানুষকে ডেকে আনা যায়!' আমি কষ্ট পেয়েছি তার এ-কথা শুনে, না-জেনে সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার সঙ্গে আমার 'ঘরে-বরে' মেলে না, তার কাছে যা 'বস্তি' আমার কাছে তা-ই স্বর্গ — প্রায়। গরিব আছি তো কী হয়েছে, আর কি কেউ গরিব নেই? তাদের কি ছেলেপুলে হচ্ছে না? কিন্তু অবনী বলে, 'জন্তুর মতো ছানাপোনা হয় ব'লেই তো এই দুর্দশা আমাদের। একটি মানুষের বাচ্চাকে বড়ো ক'রে তুলতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়।' অবনী বোঝে না, ফুটপাতে ধুলোয় গড়ানো একটা ভিখিরির বাচ্চাকে দেখলেও আমার কোলে নিতে ইচ্ছে

করে। বোঝে না, তাকে পুরোপুরি পাবার জন্যেও, পুরোপুরি ধ'রে রাখার জন্যেও, আমার সন্তান দরকার। কী ক'রে বুঝবে, সে তো পুরুষ, সে তো কখনো সত্যিকার কষ্টে পড়েনি, আমাকে নিয়ে তার তো কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ঐ যে একটা 'ভালোবাসা' নামে কথা, একটা ধারণা, তা-ই নিয়েই মশগুল হ'য়ে আছে সে। যেন ভালোবাসলেই ফসল ফলবে, জীবন কাটবে, যেন জীবন মানে অনেক বড়ো অনেক-কিছু নয়, যেন বেঁচে থাকতে হ'লে শেষ পর্যন্ত একটা নিয়মকেই আঁকড়ে ধরতে হয় না।

এমনি সব বিশ্রী কথা আমি ভেবেছি, তোমার বিরুদ্ধে — তোমার মন কত উদার, চরিত্র কত খাঁটি, সব জেনেও। তোমার সরলতাকে আমি বিশ্বাস করিনি, তোমার সততায় আমি সন্দেহ করেছি। আমাকে ক্ষমা করো। কোত্থেকে আমাকে কোথায় তুমি নিয়ে এলে আজ, যা চেয়েছিলাম তার হাজারগুণ পুরিয়ে দিলে। এবারে আমি সব বলবো তোমাকে, কত পাপ ছিলো আমার মনে, কত ছলনা, কত অন্যায় — একেবারে মন খুলে, কিছু লুকোবো না। আমি যে প্রায় অসুর ফাঁদে পড়েছিলাম, প্রায় ট'লে গিয়েছিলাম দোলনের প্ররোচনায় — সব বলবো। আমি জানি তুমি রাগ করবে না এ-সব শুনে, হাসবে, তারপর সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা বলতে-বলতে— আধো প্রেমে, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে, অর্ধেক রাত কাটিয়ে দেবো আমরা। আমার কি অন্য কিছু মনে পড়বে মাঝে-মাঝে? মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাবো? তুমি কি

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য রকম দেখবে আমাকে ?

না, সেই একটি কথা কাউকে আমি বলতে পারবো না কখনো। অবনী, তোমাকেও না।

৯

আজ তাকে উপোস করতে হচ্ছে, অবশ্য নিরম্বু নয়। এক পেয়ালা চা খেয়েছিলো সকালে, একটু আগে পাতিলেবুর জলে গলা ভিজিয়েছে। শাশুড়ি (এত ভালো এঁরা, এত যত্ন করছেন তাকে!) ফল-মিষ্টিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কমলা ইচ্ছে ক'রেই অন্য কিছু খাচ্ছে না। কী এসে যায় একটা দিন না-খেলে — আর এমন একটা দিনের মতো দিন! খুব ভালো — এই সব খুঁটিনাটি নিয়মকানুন আচার-অনুষ্ঠান, বোঝা যায় কিছু হচ্ছে, কিছু-একটা ঘটছে তোমার জীবনে, মস্ত বড়ো কিছু; এই দিন অন্য সব দিন থেকে আলাদা। খিদের কষ্ট কাকে বলে সে জানে — জেনেছিলো একটা সময়ে — কিন্তু আর দু-দিন পরে সে-ই খাওয়াবে দু-দশজনকে বাড়িতে ডেকে, হবে এক সচ্ছল সংসারের কর্ত্রী। আজ তার বেশ লাগছে উপোস করতে, শরীর ঝরঝরে হালকা, মন উদাস-মতো। কত বড়ো আকাশ জানলার বাইরে, হাওয়া। একটা রাজহাঁসের মতো শাদা ধবধবে পাখা মাথার ওপর ঘুরছে।

আসলে ওটার দরকার নেই; কিন্তু বেলা তো একটু তেতে উঠেছে এখন, তাই কে যেন চালিয়ে দিয়ে গেলো পাছে 'নতুন বৌ'য়ের গরমে কষ্ট হয়। কী সুন্দর ভান করছেন এঁরা যেন এঁদের বৌ এমনি সুখে প্রতিপালিত হয়েছে। এঁরা তো তাদের টালিগঞ্জের বাড়িও দ্যাখেননি। শীতের পরে যখন গরম পড়লো অবনী একটা টেবল-ফ্যান ভাড়া ক'রে আনলে, তাতে হাওয়ার চাইতে আওয়াজ বেশি, ছুঁলে শক্ লাগে মাঝে-মাঝে। গরমে কষ্ট হয় অবনীর — আরামের অভ্যেস তার — মুখে কিছু বলে না যদিও। বীরের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সে, তার ছবি আঁকার জন্য, এখন কমলার জন্যেও। তার ভাবটা বেশ বেপরোয়া, জোরদার—এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে, এই যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলেছে, এই সবই যেন খানিকটা গর্বের ব্যাপার তার কাছে, তার পৌরুষের প্রমাণ। হাতে কিছু টাকা এলে সে দিলদরিয়া, তক্ষুনি কমলাকে নিয়ে সিনেমা, ট্যাক্সি নেয়া চাই, কোনো দোকানের জানলায় দেখে রংটা চোখে ধরলো ব'লে হুট ক'রে চল্লিশ টাকার মান্দ্রাজি শাড়ি কিনে ফেললো, যা না-হ'লেও আপাতত স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতো। খরচে স্বভাব অবনীর, পাওনা টাকার জন্য বেশি তাগাদা করতে পারে না, বেশ টানাটানি হয় মাঝে-মাঝে, আর সেটারই শোধ নেয় সম্ভব হ'লেই বেহিশেবি টাকা উড়িয়ে, আর তার ফলে টানাটানি আরো বেড়ে যায়। নিজেকে অপরাধী লাগে কমলার — সে যদি উড়ে এসে জুড়ে না-বসতো

তাহ'লে কার তোয়াক্কা রাখতো অবনী — কিন্তু ও-সব বাজে খরচে বাধা দিতে গিয়েও সে পেছিয়ে যায়, বুঝতে পারে যে আসলে ওগুলো 'বাজে' নয়, ঐটুকু খোলা হাওয়া গায়ে না-লাগালে অবনীর স্বাস্থ্য টিকবে না, মন ভেঙে যাবে। তাছাড়া, অবনীর সঙ্গে ঘর বাঁধার পর থেকে সেও বদলে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে; জেনে না-জেনে আয়ত্ত করছে অবনীর রুচি, অবনীর শিক্ষা। প্রায়ই দুপুরবেলাটা একলা থাকে কমলা; অবনী তাকে সময় কাটাবার জন্য গল্পের বই আর পত্রিকা-টত্রিকা এনে দেয়; সে-সব প'ড়ে-প'ড়েও নানা দিকে তার চোখ-কান খুলে যাচ্ছে। সেই যে প্রথম বারো টাকা দিয়ে মিলের শাড়িখানা কিনেছিলো, যেটা দেখে অবনী বলেছিলো 'ঝিয়েদের কাপড়' (শুনে কষ্ট পেয়েছিলো কমলা, কেননা তার মা-কে সে ও-রকম শাড়ি পরতে দেখেছে) — এখন তার পক্ষেও অসম্ভব মনে হয় ওটা প'রে রাস্তায় বেরোনো। অবশ্য কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই সে সাজগোজের তুকতাক বুঝে নিয়েছিলো — ফিল্ম-স্টুডিও এ-বিষয়ে চমৎকার ইস্কুল— তাছাড়া ট্রামে-বাস্-এ ঘোরাঘুরি করলেও জানা যায় লোকেরা যাকে 'ইজ্জৎ' বলে তার কতটা অংশ চাল-চলন ফ্যাশনের ওপর নির্ভর করে। তবে এতদিন সে ধ'রে নিয়েছিলো যে ও-সব তার নাগালের বাইরে, কিন্তু অবনী এক অন্য হাওয়া বইয়ে দিয়েছে তার মনে। অবনী যে বলেছিলো মেয়েদের সাজগোজের সে কিছুই বোঝে না সেটাও ঠিক নয় — কমলাকে কোন-কোন রঙে মানাবে, কেমন ক'রে চুল বাঁধলে ভালো

দেখাবে, এ-সব বিষয়ে বেশ স্পষ্ট তার মতামত, কোনোদিন বাড়ি ফিরে কমলার পরনে ময়লা শাড়ি দেখলে রাগও করে। কিছু-কিছু সুখের ইচ্ছে কমলার মনেও উঁকি দেয় আজকাল, মাঝে-মাঝে তার মন চায় বেরোতে, সিনেমা দেখতে, ঝকঝকে রেস্তোরাঁয় ঝকঝকে কতগুলো লোকের মধ্যে আরামে ব'সে নতুন ধরনের খাবার খেতে, মনে হয় হয় একটা রেডিও থাকলে বেশ হ'তো, একটা নতুন ধরনের শাড়ি দেখলে নজর না-ক'রে পারে না। অথচ, এর যে-কোনো একটি ইচ্ছে মেটাতে গিয়ে বাজার-খরচে টান পড়ে দু-দিন পরে। কমলার খারাপ লাগে যে তার নিজের কোনো স্বাধীন উপার্জন নেই ; তার জন্য শুধু খরচ হয়, সে কিছু ঘরে আনে না।

এক-একদিন অবনীর চোখে সে ক্লান্তি দেখতে পায় — বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যখন তক্তাপোশে শুয়ে পড়ে সে, চোখ বুজে থাকে কয়েক মিনিট, তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ব'সে বলে, 'চা দাও।' এর মানে — অনেক ঘোরাঘুরি ক'রেও সে আজ টাকা পায়নি কোথাও, হয়তো পাঁচ-দশ টাকা ধার ক'রে এনেছে কারো কাছে। 'জোচ্চোরের দল! দু-শো ব'লে পঞ্চাশ টাকা হাতে দিলো, তারপর নিখোঁজ! ··· ঠিকানা আছে আপিশ নেই, আপিশ আছে তো মালিক নেই — যাকে বলে ভূতের নেত্ত!' — এমনি কিছু-কিছু কথা বেরিয়ে যায় অবনীর মুখ দিয়ে, তারপর চা খেতে-খেতে সারাদিনের ফিরিস্তি দেয় : কোথায়-কোথায় গিয়েছিলো, কোন দেনাদারকে ধরতে পারছে না আজ দশদিন

ধ'রে চেষ্টা ক'রেও, কত অল্প টাকায় দুটো পোস্টার আঁকতে রাজি হ'য়ে এসেছে — যেহেতু পার্টি ভালো, পেমেণ্ট হাতে-হাতে। এই একটা ব্যাপারে কমলার মন যেন ভ'রে ওঠে — এই যে অবনী সব কথা তাকে খুলে বলে, তার আর্থিক অসুবিধের কথাও, জীবিকা-যুদ্ধের কাঁটাগুলো লুকোবার কোনো চেষ্টা করে না, এমনকি অনেক সময় তার পরামর্শও চায় (অমুক কাজটা নেবো কিনা বলো তো ; অনেক টাকা বলছে — কিন্তু দেবে কি শেষ পর্যন্ত ?' 'ভাবছি ঐ ননীগোপাল ম্যানেজারের বাড়িতেই হানা দেবো একদিন — তুমি কী বলো ?') ; এ-সব থেকে কমলা বুঝে নেয় যে অবনী তাকে সত্যিকার জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা দিচ্ছে — অর্থাৎ স্ত্রীর। এমনি ক'রে অবনীর সব সুখ-দুঃখের, এমনকি তার অতীতের অংশিদার হ'য়ে উঠছে সে : যাকে বলে অন্তরঙ্গতা, এ কি তা-ই নয় ? অতীতেরও, কেননা অবনী তার বীডন স্ট্রিটের বাড়ির গল্পও করে কখনো-কখনো (কমলাকে কোনো ছলাকলা করতে হয় না সেজন্য) তার মা, কাকিমা, ফড়েপুকুরে তার মামাবাড়ি, তার যে-দিদির কাছে তার ছবি আঁকায় হাতে খড়ি হয়েছিলো, যার উৎসাহে কাকাকে অমান্য ক'রে আর্ট-কলেজে ভর্তি হয়েছিলো সে। শুনতে-শুনতে অন্য একটা জগতের ছবি ভেসে ওঠে কমলার মনে, মানুষগুলোকে যেন চেনা মনে হয় — অথচ তাঁদের কাছে সে কতই অচেনা, তার যে কোথাও অস্তিত্ব আছে তাও জানেন না তাঁরা। সেই জগৎ, যেখানে চারদিকে আছে আত্মীয়স্বজন, শিশুরা বড়ো হচ্ছে, নানা কাজের মধ্য দিয়ে

অতি সহজে কেটে যায় দিনগুলো, একলা ব'সে-ব'সে নিজের কথা ভাবতে হয় না — সে কি সেখানে ঢুকতে পাবে না কোনোদিন? 'তুমি কখনো যাও না বীডন স্ট্রিটে?' একদিন জিগেস করলো কমলা। 'বাঃ, যাই বইকি মাঝে-মাঝে — দুপুরবেলা, কাকা যখন কোর্টে থাকেন মা-র সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।' অবনীর এই সহজ উত্তর শুনে কমলার যেন গলা শুকিয়ে গেলো, আলতোভাবে জিগেস করলো, 'তিনি কিছু বলেন না তোমাকে?' 'কে? মা? তাঁর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা হ'য়ে গেছে, একটু সুবিধে হ'লেই তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবো।' 'তোমার কাছে? —' কমলার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী তক্ষুনি আবার বললো, 'মানে — ঐ বিয়ের ফর্ম্যালিটিটা চুকিয়ে ফেলার পরে আরকি।' 'তুমি কি তাঁকে আমার কথা বলেছো?' 'বলিনি এখনো, সময়মতো বলবো।' 'তোমার আত্মীয়েরা কেউ যদি একদিন হানা দেন এখানে?' 'তাঁরা জানেনই না আমি কোথায় থাকি,' হাসলো অবনী, 'এক বন্ধুর বাড়ির ঠিকানা দিয়েছি, আমার চিঠিপত্রও সেখানেই আসে।...তুমি কিছু ভেবো না সব ঠিক হ'য়ে যাবে, আমার সব ভাবা আছে।' কথাটা শুনে কেঁপে উঠলো কমলা, তার মনে হ'লো যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তা শক্ত মাটি নয়, কাদা, চোরাবালি, এই হঠাৎ-ভেসে-ওঠা পদ্মার চর বন্যায় তলিয়ে যেতে পারে আবার — যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে। এ-ধরনের ছলনা, চোরের মতো লুকিয়ে থাকা — এ-সব কি আর অবনীর মতো

নির্মল মনের মানুষের কাজ? কতদিন এই লুকোচুরি চালাতে পারবে সে? আর চালাবেই বা কেন? সত্যি তো তার কিছুরই অভাব নেই। সে কোনো ফেরার আসামিও নয় যে লুকিয়ে থাকবে। হঠাৎ কমলা জিগেস করলো, 'তোমার মা তোমাকে টাকা নিয়ে সাধেন না?' 'তা কি আর না সাধেন, তবে আমার নিতে খুব খারাপ লাগে।' 'সে কী! তোমার মা-র টাকা আর তোমার টাকা কি আলাদা নাকি?' 'নিশ্চয়ই! একুশের পরে আর মা-বাবার টাকা নিতে নেই, এ-ই হ'লো আমার মত। তাছাড়া আমার ছোটো বোনের বিয়ে হয়নি এখনো, আর আমার কাকা সাংঘাতিক লোক — বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন সব চড়া সুদে খাটাচ্ছেন কোথায়-কোথায়, আসলে হাত দিতে দেন না।' 'তুমি কি কক্‌খনো কিছু নাও না তোমার মা-র কাছ থেকে?' 'ক্বচিৎ কখনো অল্পস্বল্প — খুব বেশি মুশকিলে পড়লে। কিন্তু মা-কে কোনো মুশকিলের কথা বলি না আমি, বরং ভাবটা দেখাই আমার কোনো অভাব নেই। আমার বোনকে আমি তানপুরো কিনে দিয়েছি, সে কলেজে ওঠার পর পেলিকান কলম।' 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব টাকা তো তোমারই হবে। তুমি তো এক ছেলে।' 'ঐ এক-ছেলে এক-ছেলে শুনতে-শুনতে ঝালাপালা হ'য়ে গেলাম। বিশ্রী! সুদ—সম্পত্তি—বাপের টাকা — এগুলোকে আমি ঘৃণা করি, জানো? আমি চাই না অন্য কারো টাকার মালিক হ'তে, পায়ে পা তুলে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই না, আমি বোহেমিয়ান জীবন কাটাতে চাই।'

'বোহেমিয়ান মানে?' 'মানে, বাউণ্ডুলে, কোনো চাকরি করে না, কোনো নিয়মকানুন মানে না, যা রোজগার করে হাতে-হাতে উড়িয়ে দেয়, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আরকি।' 'সে কী! ও-ভাবে কি সারা জীবন কাটানো যায়?' 'কেন যাবে না? প্যারিসে, জানো, আর্টিস্টরা ও-ভাবেই থাকেন।' 'প্যারিসের কথা শুনে আমার কী হবে, আমি তো এ-দেশের মানুষ।' 'আমরাও কি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, কমলা? দুনিয়া বদলে যাচ্ছে, এক হ'য়ে যাচ্ছে। এই ধরো না দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে —' এর পরে অবনী অনেক জ্ঞানের কথা ব'লে গেলো, ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত শুনে কমলা সেই পুরোনো কথাতেই ফিরে এলো আবার, 'একটা কথা বলবো, অবনী? বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই তা তো নয়, তোমার মা-বোনেদের তুমি ভালোবাসো, তাহ'লে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফ্যালো না কেন?' 'ঝগড়া তো কিছু নয়। কিন্তু কাকা বলেছিলেন "ছবি আঁকবি? তার মানে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবি?" — সেই কথাটার জবাব দিতে হবে আমাকে। প্রমাণ করতে হবে আমি আর্টিস্ট — নিজের কাছেও, অন্যের কাছেও। এগ্‌জিবিশন করবো — ছবি বিক্রি হবে — আমার নাম ছড়াবে চারদিকে, তখন কাকার গলাতেই অন্য রকম আওয়াজ বেরোবে!'

এই কথাটায় প্রথম-প্রথম ধাঁধা লাগতো কমলার — 'আর্টিস্ট' বলতে অবনী ঠিক কী বোঝে। ছবি-আঁকিয়ে? কিন্তু ছবিই তো আঁকছে অবনী, টাকাও পাচ্ছে তার জন্য। সে যখন

আঁকে কমলা কাছে ব'সে থাকে অনেক সময়—তার অবাক লাগে কত সহজে সে ফুটিয়ে তোলে পেন্সিলের টানে তুলির টানে রঙের ছোপে যা-কিছু আছে এই ধরাধামে: মেঘ পাহাড় নদী জন্তু মানুষ গাছপালা; কোনটা দূর কোনটা কাছে কোনটা আকাশ কোনটা সমুদ্র সব বোঝা যায়; একটু-একটু টানের তফাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পুরুষ মেয়ে শিশু যুবা বৃদ্ধ — যেন হাত-সাফাইয়ের মতো ব্যাপার, কী ক'রে পারে? আরো অবাক হয় যখন কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ফোটো সামনে রেখে অবনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মস্ত একটা রঙিন ছবি এঁকে ওঠে — হুবহু সেই-সেই মানুষ, নাক চোখ ঠোঁট চুল শাড়ির ভাঁজ গালের ডৌল সব অবিকল, ফিল্মের গল্প অনুসারে চেহারাগুলোকে সাজিয়েও দেয়, মুখের ভাবে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলে ঘৃণা, হিংসা, রাগ, ভালোবাসা — সব। দিনের বেলাটা বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয় অবনীকে — কাজ পাবার, টাকা আদায়ের চেষ্টায়; তাই সে ছবি আঁকার সময় ক'রে নিয়েছে রাত্রে — খাওয়ার পরে — একটা কড়া বাল্‌বে তার টেনে কাছে নামিয়ে আনে, এন্তার সিগারেট টানে তখন, বলে 'তুমি শুয়ে পড়ো, আমার রাত হবে —' কিন্তু কমলার ব'সে-ব'সে দেখতে ভালো লাগে। 'কী সুন্দর আঁকো তুমি! আশ্চর্য!' এক-একদিন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠেছে কমলা, কিন্তু অবনী তা শুনে খুশি হয়নি, বরং একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, 'এ আর কী! এ-সব আর কে না পারে!' 'বলো কী! সবাই পারে?' 'সবাই মানে — অনেকেই। এগুলোকে ছবি বলে না।'

'কাকে বলে তবে?' যেহেতু এটা অবনীর প্রিয় কাজ, তার জীবিকারও উপায়, তাই ছবির বিষয়ে সব কথা জানতে ইচ্ছে করে কমলার — কী সেই রহস্যময় 'সত্যিকার' ছবি, যা আঁকার জন্য অবনীর এই প্রতিজ্ঞা। তক্তার দেয়ালের দিক ঘেঁষে অনেকগুলো পুরোনো ছবিওলা বিলেতি পত্রিকা সাজানো থাকে অবনীর, আর কয়েকটা খুব বড়ো মোটা-মোটা বই — সেই স্তূপ থেকে অবনী একটা পত্রিকা আর একটা মোটা বই বের ক'রে খুললো। 'দ্যাখো, এটা বিজ্ঞাপনের ছবি — সমুদ্রে ঝড়, জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু সব বিপদ থেকে বীমা তোমাকে বাঁচাতে পারে। আর এটা দ্যাখো — এই বইয়ের ছবিটা — ওঃ, পাগল হ'য়ে যেতে হয় এ-সব দেখলে।' কমলা দুটোর দিকেই তাকিয়ে দেখলো কয়েকবার ক'রে, তার মনে হ'লো বিজ্ঞাপনের ছবিটায় সমুদ্র, ঝড়, জাহাজ সব একেবারে জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে, আর অবনী যেটাকে ভালো বলছে সেটাতে সবই ঝাপসা, জাহাজটা এইটুকু ছোট্ট, আকাশ যেন উল্টে গেছে, সমুদ্র আছে কি নেই। আরো দুটো ছবি সেদিন দেখিয়েছিলো অবনী, একটাতে একটি সুন্দরী মেয়ে ঢিলে জামা প'রে বালিশে কনুই চেপে শুয়ে আছে, তার সারা শরীরে আরাম, চোখে ঘুমের আমেজ (বিছানার বিজ্ঞাপন ওটা, আর ছবিটা এমন যে সত্যি লোভ হয় ও-রকম বিছানায় শুতে), আর অন্যটা — অন্যটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলো কমলা, লাল হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'ছি! কী অসভ্য ছবি!' ও-কথা শুনে গম্ভীর মুখে একটি ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলো অবনী, যা

থেকে কমলা বুঝে নিলো যে অবনী যাকে 'আর্ট' বলে ঐ ছবি তার একটি চরম নমুনা, সারা জগতে বিখ্যাত, যে তাকানো-যায়-না-এমন নারী বা চেনা-যায় না-এমন সমুদ্র — ও-সবের মতো, বা ওর কাছাকাছি, দশ যতটুকু একশোর, অন্তত সেটুকু কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেও অবনী ধন্য মনে করবে নিজেকে। নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হ'য়ে (যদিও সেই বিবসনার দিকে তক্ষুনি সে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলে না) কমলা জিগেস করেছিলো অবনী তাহ'লে তার নিজের ইচ্ছেমতো আঁকছে না কেন ; কেন, তার মতে যা 'ভালো' নয়, সেগুলো নিয়েই এত খাটছে। 'যেহেতু আমার টাকার দরকার, তাছাড়া আর কী ?' 'ও-সবের জন্য কেউ টাকা দেয় না বুঝি ?' 'শস্তা জিনিশের হাতে-হাতে নগদ দাম জোটে, কিন্তু আর্টের কদর হ'তে দেরি হয়। যেমন ধরো —' হঠাৎ, মোটা বইটা থেকে, কোনো সুন্দরী নয়, কোনো সমুদ্র নয়, অবনী একজোড়া ছেড়া বুট-জুতোর ছবি খুলে দেখালো। 'এটা চিত্রকর বেচে দিয়েছিলেন একশো টাকায়, এখন এর দাম দশ লক্ষ টাকা — কি তারও বেশি।' কমলার মাথা ঘুরে গেলো সংখ্যাটা শুনে, এই ছবি ব্যাপারটা বিষয়ে তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। এর পর থেকে এ নিয়ে সে প্রায়ই কথা বলে অবনীর সঙ্গে, মাঝে-মাঝে উল্টে-পাল্টে দ্যাখে ঐ বড়ো-বড়ো মোটা বইগুলো ; ঐ নির্লজ্জ ছবিগুলো, অবনী যাকে 'ন্যুড' বলে, যাতে সারা-গায়ে-একছিটে-কাপড়-নেই এমন মেয়েরা নানা ভঙ্গিতে শুয়ে ব'সে থাকে, সেগুলোর দিকেও সাহস ক'রে তাকিয়ে দ্যাখে সে —

ভাবতে চেষ্টা করে কী সেই রহস্য, যা ধরার জন্য অবনী এত ব্যাকুল, যার জন্য সে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি ছেড়ে, এই দারিদ্র্যে, বাউণ্ডুলেপনায়। আর তারপরেই তার নিজের চিন্তায় ফিরে আসে কমলা — অবনী হাত বাড়ালেই সব সুখ পেতে পারে ; হয়তো, কাকার আপত্তি সত্ত্বেও, তার মনোমতো ছবি আঁকতেও পারবে তখন—কিন্তু তার, কমলার, ত্রিভুবনে কেউ নেই, কিছু নেই—একমাত্র এই অনিশ্চিত অবনী ছাড়া।

১০

পেরিয়ে গেলো দুপুর, দেড়টা-দুটো বেলা মনে হচ্ছে, বাড়ির লোকেরা একতলায়, খাওয়াদাওয়ার সময়। মাথার ওপরে ছাদেও আর সোরগোল নেই ; শামিয়ানা খাটানো, চেয়ার-টেবিল সাজানো সাঙ্গ হ'লো। বিয়ের লগ্ন এগিয়ে আসছে, কাল সকাল থেকে সে অন্য মানুষ। ঝিমুনি এলো কমলার, একলা ব'সে, চুপচাপ দুপুরে ; জেগে উঠে বুঝলো ঐ আধো ঘুমে, কয়েক মিনিটের মধ্যে, সে একটি স্বপ্ন দেখে উঠেছে। মেঘলা দিন, টিপটিপ বৃষ্টি, ম্যুজিয়মের কাছে বাস্ থেকে নামলো, হাঁটছে, বাড়ির গায়ে নম্বর দেখে-দেখে। স্বপ্ন, না সত্যি? উঠে এলো দোতলায়, ঢুকেই একটা সুগন্ধ পেলো ঝাপসা, কেমন ঠাণ্ডা — কী আরামের, কী ক'রে এত ঠাণ্ডা হ'লো হঠাৎ? উজ্জ্বল ঘর, উত্তরে সারি-সারি জানলায় বরফের

মতো ঝকঝকে কাচ, মাথার ওপরে ঢাকনা-পরানো লম্বা-লম্বা টিউবের বাতি, যেন রোদের আভা, কোনো শান্ত নরম সকালের পরে সময় আর নড়েনি। এত বড়ো ঘর, এত ছবি — মানুষটিকে প্রথমে দেখতে পায়নি কমলা।

আমার মন অস্থির, একটা হারাই-হারাই ভাব হয়েছে অবনীকে নিয়ে। সে যদি ছেড়ে দেয় আমাকে, তার আত্মীয়েরা কোনো ফাঁদ পাতে, বা অন্য কোনো মেয়েকে দেখে অবনী আমাকে ভুলে যায় (সেটা হ'তেই পারে, আমি তো তার যোগ্য নই সত্যি), তাহ'লে ? তাছাড়া, যদি ধ'রে নেয়া যায় আমরা স্বামী-স্ত্রী তাহ'লেই বা আমি ঘরে ব'সে থাকবো কেন নিষ্কর্মা হ'য়ে, আমাকে তো ছেলেপুলে মানুষ করতে হচ্ছে না, আমার ঘরকন্নাও খেলা-খেলা ব্যাপার। এটা কলকাতা, চারদিকে সব উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে, কত রকম কাজ করছে মেয়েরা — পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে আপিশেও যাচ্ছে অনেকে। আমি কি কোনো শেলাইয়ের কাজ পেতে পারি না, বোনার কাজ, কোনো দোকানে জিনিশ-বিক্রির জন্য নেয় না আমাকে ? কলকাতায় নিশ্চয়ই কোনো অসুস্থ মহিলা আছেন, যাঁকে দেখাশোনার জন্য, বই প'ড়ে শোনাবার জন্য, লোক চাই ? কিন্তু অবনী এ-সব কথা কানেই তোলে না, ওগুলো তার মতে 'ছোটো কাজ'। 'বরং প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনেল পাশ করো না, তারপর কলেজে পড়বে।' 'কিন্তু চার বছর লাগবে যে বি. এ. পর্যন্ত পাশ করতে।' 'লাগলোই বা, তাড়া কিসের ?' কেন আমার তাড়া তা অবনীকে বলা যায় না অবশ্য : আমি

তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। শান্তি-মাসির বাড়িতে যে-পোকাটা আমার মাথায় ঢুকেছিলো (মাসি আর অম্বু মিলেই ঢুকিয়েছিলো, সত্যি বলতে), সেটাই আবার ফড়ফড় করছে আমার মগজের মধ্যে। আমি 'আনন্দবাজারে' বিজ্ঞাপন দেখি রোজ, এক-আধটা চিঠিও লিখি কখনো বা -- জবাব আসে না। তারপর একদিন সেই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়লো : 'চিত্রশিল্পীর জন্য মহিলা মডেল চাই ···'

'মডেল' কাকে বলে তা, অন্য অনেক-কিছুর মতোই, আমি নতুন জেনেছিলাম। অবনীর সঙ্গে এ নিয়ে একদিন কথাও হয়েছিলো। সত্যিকার জ্যান্ত মানুষকে সামনে বসিয়ে দেখে-দেখে ছবি আঁকেন শিল্পীরা, তাদেরই সাজান দেব-দেবী ইন্দ্র বেহুলা ইত্যাদি, অবশ্য সঙ্গে অনেকটা কল্পনা মিশিয়ে — সেই মানুষগুলোকে 'মডেল' বলে, ব'সে থাকার জন্য টাকাও পায় তারা। বিলেতে (অবনী 'বিলেত' বলে না, বলে 'য়োরোপ') নাকি এটাই নিয়ম, আমাদের দেশে আগে ওটার রেওয়াজ ছিলো না, আজকাল ব্যবহার করছেন কেউ-কেউ। আরো অনেক-কিছু বলেছিলো অবনী, অনেক ইংরেজি বুলি ছিটিয়ে, আমি ভাবটা দেখাচ্ছিলাম যেন সবই বুঝতে পারছি। 'ঐ বইগুলোতে যে-সব ছবি দেখছো, মডেল কারা ছিলেন জানো তো? শিল্পীদেরই স্ত্রী বা প্রেমিকারা।' 'সে কী!' আঁৎকে উঠেছিলাম আমি, 'কোনো ভদ্রমহিলা কি কখনো রাজি হবেন ঐ···ঐ···' 'কেন হবেন না?' হালকা ক'রে হেসেছিলো

অবনী। 'তাঁরা তো আর অমুক-অমুক মহিলা থাকছেন না, ছবি হ'য়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া অত লজ্জা-শরমের বালাইও নেই ও-সব দেশে।' তার কথা শুনে আমি থ ব'নে গেলাম; স্ত্রী, সন্তানের মা, সব বড়ো-বড়ো ঘরের বৌ-ঝিও নাকি — তারা গা খুলে, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত হাট ক'রে, মাথায় হাত তুলে, বিছানায় গা এলিয়ে —ছি! 'ছবি হ'য়ে গেলো' — তার মানে কী? ছবিটা তো দেখছে সবাই, দুনিয়ার লোক দেখছে, চেনা তো যাচ্ছে মানুষটা কে! কিন্তু অবনী আমাকে বোঝায় ঐ 'ন্যুড' ছবি নাকি দারুণ উঁচু দরের ব্যাপার, আঁকিয়েরা নাকি তা-ই দিয়ে বোঝান তাঁরা কতদূর ওস্তাদ — আর সত্যি বলতে 'ন্যুড' নারীমূর্তির মতো 'সৌন্দর্যের প্রতিমা' নাকি আর-কিছু নেই। আমি রেগে জবাব দিয়েছিলাম, 'তার কারণ — আঁকিয়েরা সবাই পুরুষ, আর সব পুরুষেরই কামরিপু উগ্র।' অবনী হেসে বলেছিলো, 'তা হ'তে পারে, কিন্তু ছবি অন্য জিনিশ, তাতে কামগন্ধ থাকে না।'

অবনী, তোমারই কাছে, আমার সব শিক্ষাদীক্ষা, তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছো, মনে দিয়েছো বল-ভরসা। আমি মানুষ হয়েছিলাম একেবারে অন্য আওতায়; সেখানে এগারোয় পড়ার পর থেকে 'চোখে-চোখে' রাখা হয় মেয়েদের, মুহূর্তের জন্য তাদের বুকের আঁচল স'রে যাওয়াটা দোষের, ঘুমের মধ্যেও সারা গা ঢেকে রাখা চাই। শহরে এসে, মাসির বাড়িতেও, বুঝেছি যে স্ত্রীলোকের শরীরটাই পাপের আকর। এই শরীর থেকে সুখের আস্বাদ, তাও

প্রথম তোমারই কাছে আমি পেয়েছি; মাদারিপুরে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো তিনি তা দিতে পারেননি আমাকে, বড্ড হঠাৎ, বড্ড কড়া, চৈত্রমাসের ধুপধাপ শিলা-বৃষ্টির মতো হয়েছিলো সেটা। আমি পেয়েছি শরীরের সুখ তোমার কাছে, কিন্তু সেজন্যে লজ্জা করেছে, জানো — যেন ওটা উচিত নয়, ভালো নয়; ব্যাপারটা আসলে পুরুষেরই, মেয়েরা শুধু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে (সন্তান পাবার জন্য), আমার ছেলেবেলার শিক্ষার মধ্যে এটাও ছিলো। সে-সব ভুলিয়ে তুমি আমাকে নতুন ক'রে গড়লে, অবনী, সেই কয়েক মাসে, টালিগঞ্জের টালির ছাদওলা বাড়িটায়। তুমি যা বলো তা সবই আমার কাছে নতুন, কোনো-কোনোটা পিলে-চমকানো — আমি ঝাঁঝিয়ে উঠি, রেগে যাই, কিন্তু— যেহেতু তোমাকে নিজের চাইতে অনেক বড়ো ব'লে ভাবি, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, অনেক বেশি খোলা মনের মানুষ — তাই তোমার কথাগুলো, কখন বুঝি না, গেঁথে যায় আমার মনের মধ্যে, নিজে না-জেনে তোমারই পায়ে পা ফেলে চলতে শুরু করি। তুমি ছবি আঁকো, আঁকতে চাও, আমিও তাই ছবি ভালোবাসছি; তুমি বলো আর্টিস্টরা সমাজ-সংসারের নিয়মের বাইরে, তাঁরা বিয়ে না-ক'রে ঘর করলে দোষ হয় না, এমনকি তাঁদের সামনে গা খুলে ব'সে থাকাও কোনো মহিলার পক্ষে কলঙ্কের কথা নয় — আমি এগুলো মানতে পারি না কিছুতেই, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবো, এমনও আমার শক্তি নেই, যেহেতু তা তোমার মুখে শুনেছি। তাই আমার এত সাহস হয়েছিলো

যে সেই মেঘলা দিনে উঠে এসেছিলাম সদর স্ট্রিটের দোতলায়, তোমাকে লুকিয়ে, তোমাকে পালিয়ে, তোমার মতের বিরুদ্ধে।

'কে? আলোক পাল? নামটা চেনা মনে হচ্ছে। ...আরে, আলোক পাল তো নামজাদা ছিলেন এককালে, আমি স্কুলে পড়ি তখন, একেবারে নতুন ধরনের ছবি এঁকে কিছুটা হৈ-হৈ তুলেছিলেন। আমি দেখেওছি তাঁর সে-সময়কার দু-একখানা ছবি: অবনবাবুদের স্কুল, শান্তিনিকেতন, যামিনী রায়, কারোরই সঙ্গে মেলে না — ছবির মধ্যে নাটক আনার চেষ্টা করছিলেন, একটা তোলপাড়, মোটা-মোটা তুলির আঁচড় যেন ফ্রেমের সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে। ... তা উনি তো শুনেছি প্যারিসে চ'লে গিয়েছিলেন সেখানেই থাকবেন ব'লে, ফিরেছেন নাকি? ... না, না, তোমাকে মডেল হ'তে হবে না, কিন্তু ঠিকানাটা রেখে দাও, এমনি একদিন যাবো তোমাকে নিয়ে, আমিও দেখা করতে চাই, তাঁর নতুন ছবি দেখতে চাই।' আমি বললাম, 'আমার চেষ্টা করার মানেও হয় না সত্যি, আমি তো সুন্দরী নই।' 'এই একটা বোকার মতো কথা বললে। মডেল সুন্দরী না-হ'লেও ছবিটা সুন্দর হ'তে পারে, আর তাছাড়া — তুমি দেখতে তো সত্যি ভালো।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'গিয়ে দেখবো নাকি একবার? যদি বা লেগে যায় সংসারে কিছুটা হাল ফেরে হয়তো, তোমাকে অত বেশি খাটতে হয় না। কী বলো?' 'পাগল নাকি?' কথাটা সেখানেই চাপা পড়লো, তোমার তাড়া ছিলো, তক্ষুনি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে।

১১

'পাগল নাকি!' — কথাটা কোথায় যেন বিঁধলো আমাকে, সারাদিন ভুলতে পারলাম না। তার মানে, অবনী রাজি নয়, এক মিনিট ভেবেও দেখলো না, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো। অথচ, এই ছবি নিয়ে, আঁকিয়েদের নিয়ে, মডেলদের নিয়েও, কতই না উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, আর বিজ্ঞের মতো কথা বলে সে, তারও সব আশা ও চেষ্টার লক্ষ্য সেইদিকেই। আর ঐ আলোক পাল, যিনি বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন, তিনিও আজে-বাজে কেউ নন, অবনী তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভক্তি করে। তাহ'লে আপত্তি কেন? মানে হ'লো — অন্যদের বেলায় সবই ধন্যি-ধন্যি, কিন্তু নিজের বৌকে ঘেঁষতে দেবে না ধারে-কাছে। বোঝা যাচ্ছে অবনী আমাকে সত্যি ভালোবাসে, সম্মানও করে; আমার খুশি হওয়া উচিত; তাকে বিশ্বাস ক'রে — বিয়ে সে আমাকেই করবে এটাতে বিশ্বাস ক'রে শান্ত মনে অপেক্ষা করাই উচিত আমার। হ্যাঁ, খুশি আমি হচ্ছি বইকি, কিন্তু তবু একটা তর্ক ঠেলে উঠছে আমার মনে: তবে কি সত্যি মডেল্ হওয়াটা খারাপ কিছু, ঐ ছবিগুলোর সুন্দরীরা কি নষ্ট মেয়ে ছিলেন, আঁকিয়েদের স্বভাব-চরিত্র কি ভালো হয় না — না কি অবনীরই কাজে আর কথায় মিল নেই? যদি মডেলের কাজে কিছু অসম্মান না থাকে (অবনীর কথা থেকে আমি তা-ই বুঝেছি) আর অল্পস্বল্প রোজগারও তাতে হয় যদি, তাহ'লে কেন নেবো না? সারাদিন আমি একা-একা হাঁপিয়ে উঠি

বাড়িতে — উপন্যাস প'ড়ে কত আর সময় কাটানো যায়, কলকাতায় পাড়া-পড়শি ব'লে কিছু নেই, আমার পক্ষে কেমন যেন হারেমের জীবন হয়েছে — বাইরের ঐ বড়ো জগৎটাকে জানতে আমারও কি ইচ্ছে করে না? আমাকে যে কী ভূতে পেলো জানি না, যেন পরখ করতে ইচ্ছে করলো ব্যাপারটা সত্যি কী; একটু যত্ন নিয়ে সাজগোজ ক'রে রাস্তায় এসে বাস্ ধরলাম।

কিন্তু ও-রকম একটা কথা শুনেও আমি চ'লে আসিনি কেন, দ্বিতীয় কথাটি না-ব'লে তক্ষুনি কেন বেরিয়ে আসিনি? ও-রকম যে বলবেন তা আমার কল্পনাতেও ছিলো না। হঠাৎ, বোধহয় একটা বড়ো ছবির আড়াল থেকে উনি বেরিয়ে এলেন, আধ-বুড়ো মানুষ, মাথায় টাক, লম্বাটে তেকোনা-মতো মুখ, প্যাণ্টের সঙ্গে আঁটো একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরেছেন, সেটার রং অপরাজিতা ফুলের মতো নীল। আমি মনে মনে বললাম, 'ইনি তাহ'লে তাঁদেরই একজন, অবনী যাঁদের বলে "সত্যিকার আর্টিস্ট"!' তাঁর পোশাক একটু অদ্ভুত লাগলো আমার চোখে (অমন গাঢ় রং আমাদের দেশে শুধু বাচ্চারা আর মেয়েরা পরে), কিন্তু চেহারায় তেমন অসাধারণত্ব কিছু দেখলাম না, শুধু চোখ দুটো ভারি জ্বলজ্বলে। 'কী চান আপনি?··· ও, মডেল হবার জন্য?' এক ঝলক তাকালেন আমার দিকে। 'আপনার বিয়ে হয়েছে?' এক সেকেণ্ড দেরি ক'রে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ।' 'স্বামীকে বলেছেন?' 'বলেছি।' 'তাঁর আপত্তি নেই তো?' 'তাঁর আপত্তি থাকলে আমি আসবো

কেন?' 'আগে কখনো মডেলের কাজ করেছেন?' 'না।' উনি চোখ দুটি একটু ছোটো ক'রে আর-একবার তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, গায়ের রংটা ঠিক আছে, শামলা-শামলা, এই রকমই খুঁজছিলাম। দেশ বোধহয় পূর্ববাংলায়?' 'ছিলো।' 'আপনার নাম কী?' 'আমার নাম ··· শ্যামলী।' 'নামও শ্যামলী? বাঃ। পদবি?' আমি বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, 'সিংহ।' 'শ্যামলী সিংহ —' উনি একটা নোটবইয়ে লিখে নিলেন নামটা। 'ঠিকানা?' 'আমরা অস্থায়ীভাবে আছি এক জায়গায়, ঠিকানার কি দরকার আছে?' 'আপনি যদি সময়-মতো রোজ আসতে পারেন তাহ'লে দরকার নেই।' 'কখন আসতে হবে?' 'সকাল দশটা থেকে বারোটা আপনার সুবিধে হবে?' 'অন্য সময়ে হয় না? দুপুরবেলায়?' 'দুপুর — আচ্ছা, দুটো থেকে চারটে? ঠিক আছে? সপ্তাহে তিন দিন, রোজ পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেবো। শুতে হবে?' আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। উনি কী বলছেন? আমি কি ঠিক শুনেছি? রোজ পঞ্চাশ, সপ্তাহে দেড়শো, মাসে ··· শুধু একটু সেজে-গুজে ব'সে থাকার জন্য এত টাকা! আমি চেষ্টা ক'রে আওয়াজ বের করলাম গলা দিয়ে, 'কতদিন চলবে কাজটা?' 'তা বলতে পারি না এখন — একমাস, দু-মাস, বেশিও হ'তে পারে। তবে আপনি কাজটা নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে আমি কিন্তু মুশকিলে পড়বো। আপনি পারবেন কিনা ভেবে দেখুন।' 'পারবো না কেন?' 'আচ্ছা বেশ, তাহ'লে একটু দেখে নেয়া যাক —' আর তারপরেই সেই সাংঘাতিক

কথাটি তিনি উচ্চারণ করলেন যা শোনামাত্র আমার মুখে যেন এক হাজার আলপিন ফুটলো, ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ হ'তে লাগলো কানের মধ্যে।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেলো, আমি উঠলাম না, নড়লাম না, কথা বললাম না। 'আমি যে-ছবি আঁকবো সেটা ন্যুড। তাই একবার দেখে নিতে চাই। কিন্তু আপনার অসুবিধে হ'লে থাক। আমি জানি এ-দেশের মেয়েদের পক্ষে খুব শক্ত ওটা। আপনি তাহ'লে —' উনি ঝাপসা একটা বিদায়ের ভঙ্গি করলেন, আমি মনে-মনে বললাম, 'রোজ পঞ্চাশ টাকা, রোজ পঞ্চাশ টাকা।' তারপর যেন অচেতনভাবে উঠে এলাম পর্দা-ঘেরা ড্রেসিংরুমে, মস্ত লম্বা আয়নার মধ্যে আমি, সেই প্রথম পুরোপুরি নিজের চেহারাটা চোখে দেখলাম।

না, শ্যামলী— না, কমলা— শুধু টাকার জন্য নয়। তোমাকে পেয়ে বসেছিলো একটা অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল। তুমি চাপা দিয়েছিলে তোমার রক্তকণার বিদ্রোহকে, ভুলে গিয়েছিলে তোমার আজন্মের সব সংস্কার। যে-কারণে তুমি বিয়ের জন্য ব্যাকুল, যে-কারণে তুমি অবনীর ভালোবাসা পেয়েও অশান্ত — সেই সামাজিক স্বীকৃতি, সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, সব ছাপিয়ে উঠেছিলো তোমার মনে এক নতুন ইচ্ছা, নতুনের জন্য লুব্ধতা (যার বীজ অবনী তোমাকে দিয়েছিলো) — এক নষ্ট, উজ্জ্বল, বাঁধন-ছেঁড়া, নিষিদ্ধ জগতের জন্য, যার আভাস তুমি পেয়েছিলে সদর স্ট্রিটের ঐ ঘরটায় পা দেয়া মাত্র, ঐ ঝকঝকে কাচের জানলাগুলোতে, সকালবেলার আভার মতো

চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া নরম আলোয়, পায়ের তলার কার্পেটে, নরম গভীর মেরুন রঙের সোফাটায়, আর সেই টাক-পড়া আধবুড়ো মানুষটিতে, যার চেহারায় প্রথমে কোনো অসাধারণত্ব তুমি দেখতে পাওনি। যেন একটা মোহের মধ্যে পড়েছো, যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছো আর সেই স্বপ্নকে সত্যি ক'রে তোলার জন্য চেষ্টা করছো প্রাণপণ। কত সহজে মিথ্যেগুলো বেরোলো তোমার মুখ দিয়ে! কত সহজে সন্ধেবেলা অবনীকে বললে, 'তুমি অ্যাশট্রের কথা বলছিলে ক-দিন ধ'বে, তাই আনতে বালিগঞ্জে গিয়েছিলাম। দুটো নতুন চায়ের পেয়ালাও এনেছি।' (আসলে ওগুলো মোড়ের মনোহারি দোকানে কেনা।) আর সেই পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে বললে, 'জানো, আজ আমার মাদারিপুরের এক বাল্য-সখীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়। বিরাট গিন্নিবান্নি হ'য়ে গেছে দেখতে, আমি চিনতে পারিনি, সে কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো, "কমলা না?" কাছেই থাকে, এক ট্রামেই ফিরলাম আমরা, আমাকে যেতে বললো বার-বার ক'রে। ভালোই হ'লো — মাঝে-মাঝে একটু গল্প-টল্প ক'রে আসা যাবে।' — তুমি কি কখনো ভেবেছিলে যে এত ছলনা তুমি পারো, তাও ঐ সরল বিশ্বাসে ভরা অবনীর সঙ্গে? বাল্যসখীটিকে তুমি উদ্ভাবন করলে সুদ্ধু এইজন্যে যাতে কোনোদিন অবনী যদি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দ্যাখে তুমি নেই, তাহ'লে বলতে পারো, 'পারুলের ওখানে গিয়েছিলাম।' আর আজ — এই তোমার বিয়ের খাটের নতুন

জাজিমে ব'সে-ব'সে তুমি ভাবছো : 'আমি কী ক'রে পারলাম, কী ক'রে পেরেছিলাম ?' একটু-একটু ভয় করছে তোমার, পাছে কখনো কেউ জেনে ফ্যালে। না, শ্যামলী — না, কমলা — ভয় নেই তোমার, কেউ জানবে না। আলোক পাল অনেক দূর দেশে চ'লে গেছেন, এতদিনে কলকাতার সেই বাঙালি মডেলটি মুছে গেছে তাঁর মন থেকে, আগেই মুছে গিয়েছিলো। তাঁর ছবির জন্য তুমি, তাঁর কাছে ছবিই সব, তুমি কেউ নও। আর সেই ছবিও এমন যে তা যদি কলকাতার লোকেরা দেখতেও পায় কখনো, কেউ সন্দেহ করবে না যে সত্যবতী আসলে এই বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যে-বাড়ির বৌ, গোপেন সবজজের পুত্রবধূ। অবনী দেখলেও চিনবে না তোমাকে, কেননা অবনী যাকে 'তুমি' ব'লে জানে সে ঐ ছবির মেয়ে নয়, সে বেদব্যাসের মা হবে না।

১২

প্রথম তিন দিন ভীষণ কষ্ট পেলো কমলা। তার দুই হাত যেন হাজার হাত হ'য়ে তাকে রক্ষা করতে চায়, তার চুল চায় ছড়িয়ে-ছড়িয়ে তাকে ঢেকে দিতে, কোনো পুরোনো মন্দিরের গা-বেয়ে-ওঠা লতাগুল্ম আগাছার জঙ্গলের মতো। সে নড়তে পারে না, চোখ মেলে তাকাতে পারে না। কখনো, জীবনে কখনো, যেদিন সে ঝড়ের মুখে পাতার মতো উড়ে এসে

পড়েছিলো মাদারিপুর থেকে শেয়ালদা স্টেশনে, যেদিন অসুর নোংরা হাত দুটো এগিয়ে এসেছিলো তার দিকে, আর যেদিন শান্তি-মাসির আশ্রয়টুকুও তার পায়ের তলা থেকে স'রে গিয়েছিলো — না, সেদিনও নিজেকে এমন অসহায় তার মনে হয়নি, এমনভাবে সারা জগতের পরিত্যক্ত, যেন আত্মরক্ষার কোনো উপায় আর নেই তার, সে যেন অন্য সব মানুষের অচেনা হ'য়ে গিয়েছে। রাস্তার ভিখিরিরও যা আছে তাও এখন নেই তার। 'সাজগোজেই সম্ভ্রম' — অবনী তাকে বলেছিলো সেই বারো টাকা দামের 'ঝিয়েদের কাপড়'টা দেখে। শুধু সম্ভ্রম কেন, মনুষ্যত্বও তাতেই। পশু কাপড় পরে না, মানুষ পরে। যাত্রায় কত সহজে চেনা যায় রাজা, মন্ত্রী, সেনা-পতিকে ; তেমনি আসলেও দেখামাত্র বুঝি কে বোষ্টমি, কে বাউল, কে জমিদার-গিন্নি, কে চাষি-ঘরের বৌ। মুখে কিছু লেখা থাকে না, বাইরের আবরণটাতেই চিহ্ন, প্রমাণ। সেই চিহ্ন, যা আমাদের শরীরেরই অংশ হ'য়ে গেছে বলা যায়, যা বাদ দিয়ে নিজেদের চেহারা আমরা কল্পনাও করি না, তা যদি একেবারে সরিয়ে নেয় কেউ, তাহ'লে মানুষকে অন্য কোনো জীবে কি পরিণত করা হয় না, যেন কোনো ডাঙার প্রাণীকে হঠাৎ জলের তলায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে তার নিশ্বাসের বাতাস নেই ?

এমনি ভেবেছে কমলা, সেই নরম মেরুন রঙের সোফাটায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে-প'ড়ে, হাতে মুখ ঢেকে, নিঃসাড়, মাঝে-মাঝে নিজেরই অজান্তে কেঁপে-কেঁপে উঠে। তারপর ভেবেছে :

অথই জলে ঝাঁপ যখন দিলোই, তখন সাঁতার কাটার চেষ্টা করাই তার উচিত। যে-অবস্থায় কেউ তাকে কখনো দ্যাখেনি, তার স্বামী না, অন্ধকারে ছাড়া অবনীও না, সে অবস্থায়, এই ঝকঝকে উজ্জ্বল আলোয়, উনি যখন তাকে দেখলেনই, তখন আর পেছিয়ে গিয়ে, কুঁকড়ে থেকে কী হবে, বরং মনে সাহস আনা যাক, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা। মনে পড়লো তার এক জ্যাঠতুতো দিদি প্রথম সন্তান হবার পর কথায়-কথায় একদিন বলেছিলো, 'মেয়েদের আবার লজ্জা-শরম! বাচ্চা হ'তে গেলে কিছুই থাকে না।' প্রসবে কষ্ট পেয়েছিলো দিদি, দাইয়ে কুলোয়নি, পুরুষ ডাক্তার ডাকতে হয়েছিলো। কিন্তু, একটা সন্তান পাবার জন্য সবই করা যায়, শরীরের কষ্টে নাকি জ্ঞানও থাকে না তখন। কিন্তু — এটা কিসের জন্য? কেন সে মেনে নিচ্ছে এই কষ্ট, এই লজ্জা, এই ভীষণ, ভীষণ অপমান? কিসের জন্য এটা, কী জন্মাবে এ থেকে, কী পাবে কমলা? শুধু দৈনিক পঞ্চাশটা টাকার জন্য — ছি! সে এত লোভী, এত খারাপ!

— কিন্তু, এর পেছনে অন্য কিছু নেই তো? অতগুলো টাকা, তার বিনিময়ে আরো কিছু আদায় ক'রে নেবার মৎলব নেই তো? গোড়ায় যদি নাও থেকে থাকে, পরে তা জেগে উঠতে কতক্ষণ? পুরুষ, মেয়েমানুষ: বাঘ আর হরিণ, আগুন আর ঘি, খাদক আর খাদ্য — কতবার এ-সব কথা শুনেছে ছেলেবেলায়। তার জ্যাঠাইমা বলতেন, 'পুরুষ এক জাত! শ্বশুর-ভাসুর কাউকে বিশ্বাস নেই।' আর অম্বু — আর

চারদিকে কত তেলতেলে চোখ, হ্যালহেলে হাসি — এ-সব তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। তাহ'লে উনি — ঐ আধ-বুড়ো টাক-পড়া মানুষটি — উনিই বা কেন ধর্মপুত্র হ'তে যাবেন? একা থাকেন দেখছি, ঘরের দরজা বন্ধ, আমি চ্যাঁচামেচি করলেই বা কে শুনবে? অবনীর মত ছিলো না, সে কি এই ভয়েই? 'মডেলরা কারো স্ত্রী, কারো বা প্রেমিকা —' তবে কি আঁকিয়েদের মধ্যে এটাই রেওয়াজ, রথ দেখা কলা বেচা একসঙ্গে? ভয়ে কমলার গায়ে কাঁটা দিলো — হায় হায়, এই সহজ কথাটা সে ভাবলো না আগে! না, আমার হাত আছে, আমার দাঁত আছে — আমি অম্বুকে ঢিট করেছিলাম — আমি দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো আমার সঙ্গে কোনো চালাকি চলবে না, আমি বিবাহিত — হ্যাঁ, বলতে গেলে তো তা-ই — না, এ অসহ্য, আমি আর এক দণ্ড থাকবো না এখানে।

'ও-রকম্ করলে চলবে না তো, সহজ হ'তে হবে, মুখ তুলতে হবে, তাকাতে হবে আমার দিকে। যখন যে-রকম বলবো সেই ভাবে থাকতে হবে। ভয় কী — কিচ্ছু দেখা যায় না বাইরে থেকে, কেউ হঠাৎ এ-ঘরে ঢুকে পড়বে না। একটু সহজ হবার চেষ্টা করো। আমার যে সময় নষ্ট হচ্ছে, আমি যে কাজটা ধরতেই পারছি না এখনো। এদিকে ছবিটা ভেসে-ভেসে উঠছে আমার মনে — সারাদিন ধ'রে ভাবছি, বহুদিন ধ'রে ভাবছি, মডেলও ঠিক পাওয়া গেছে, আর দেরি করা যায় না। ··· খুব অসুবিধে হচ্ছে তো? আচ্ছা, এবারে—'

(কমলা টের পেলো একটা নরম চাদর তার ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো) —'এবারে বোধহয় ঠিক আছে ? এখন মুখ তোলো, তাকাও। শ্যামলী, তুমি মহাভারত পড়েছো ? ছেলেবেলায় পড়েছিলে, ছোটো মহাভারত ? কোথায় ছিলে তুমি ছেলেবেলায় ? কী বললে ? মাদাবিপুর ? সেখানে নদী আছে না ? আমি যাইনি কখনো মাদারিপুবে, কিন্তু আমিও পদ্মাপারের মানুষ, পুজোর সময় যেতুম ছেলেবেলায়। আমাদের বাড়ির দুর্গা ছিলেন অর্ধ-কালী, মুখের একদিক নীল, আর-এক দিক টকটকে লাল। রাগি চেহারা। মাদারিপুরে মজুমদার-বাড়িতেও তা-ই ছিলো ? আশ্চর্য। আমি কিন্তু দুর্গাকে রাগি ব'লে ভাবি না, তিনি যে মহিষাসুর বধ করছেন তার পেছনে কোনো রাগ নেই — আমাদের প্রতিমায় অসুরের বুকে রক্ত এঁকে দেয় সেটা আমার বিশ্রী লাগে। দুর্গা, ছিপছিপে সুন্দরী দেবী, তাঁকে কি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলে মানায় ? তিনি টোকা দিলেই তো অসুর আর নেই। ঠিক এই ভাবটি দেখতে পাবে এলুরার একটি মূর্তিতে, দুর্গা সেখানে মহিষের পিঠের ওপর একটি পা রেখেছেন শুধু — আস্তে, খুব আলতোভাবে, আর-একটি হাতে ওর মুখটা যেন চেপে আছেন, আর জন্তুটা যেন ঐটুকুতেই নিঃসাড় হ'য়ে গেছে, প্রায় বলা যায় মৃত্যুর নেশায় বিহ্বল। কী শান্ত সেখানে দেবী, যেন অলস, নিশ্চেষ্ট, কিন্তু ওটুকুর বেশি তাঁর দরকার নেই তো সত্যি। এর উল্টো মূর্তিও আছে অবশ্য মহাবলীপুরমে — প্রায় একই সময়কার — দুর্গা সেখানে যাকে বলে রণরঙ্গিণী,

ধনুক তুলে তীর ছুঁড়ছেন তিনি, তাঁর সিংহটি দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, আর ক্ষত্রিয়ের মতো শরীরের ওপর মহিষের মুণ্ড দিয়ে অসুরও রুখে দাঁড়িয়েছে গদা নিয়ে — কিন্তু দুর্গা এত ছিপছিপে, এমন তরুণ, এমন সতেরো বছরের মেয়ের মতো দেখতে, যে মনে হয় ওটা আসল যুদ্ধ নয়, একটা খেলা, অভিনয়, যাকে বলে মায়া, তা-ই। তা বাঙালির দুর্গাপূজাও একটা চমৎকার নাটক, মায়ার খেলা — আগমনী থেকে বিসর্জন পর্যন্ত — তিনটি মাত্র দিনের জন্য কী বিরাট আয়োজন ভেবে দ্যাখো, কিন্তু তারপর মাটির প্রতিমা জলে গ'লে-গ'লে মাটিতে ফিরে যান, একটি সুন্দর বিরহ ছড়িয়ে পড়ে আবার-নীরব-হ'য়ে-যাওয়া দশমীর রাতটিতে। তোমার মনে পড়ে, শ্যামলী, দশমীর জ্যোছনা? কেমন করুণ, অথচ আনন্দে মেশা। উঠোনে ছায়া, লোকেরাও যেন আস্তে চলাফেরা করছে, ছায়ার মতো। প্রণাম, কোলাকুলি, বাড়ি-বাড়ি ঘোরা, মিষ্টিমুখ, ভাবটা যেন সকলেই সকলকে ভালোবাসছে, কিন্তু দু-দিন পরেই আবার মামলা, মিথ্যে সাক্ষী, লাঠি দিয়ে ভাইয়ের মাথা ফাটানো। কিন্তু তাই ব'লে সেই মুহূর্তটি মিথ্যে হবে কেন? দশমীর রাত, মাথার ওপরে আধখানা চাঁদ, উঠোনে ছায়া — যাকে ভালোবেসেছি, পুজো করেছি, যা নিয়ে এত আনন্দ করেছি, সেই জিনিশটিকে আমরা নিজের হাতে বিসর্জন দিয়ে এলাম নদীর জলে, আমাদের মন তাই শুদ্ধ, নির্মল, তখনকার মতো কারো ওপর আমাদের রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। আর সেই যে মুহূর্তের জন্য আমরা ভালো হয়েছিলাম,

যেন তারই পুরস্কার এলো লক্ষ্মীপূর্ণিমায় — ফুটফুটে চাঁদের আলো, মস্ত-মস্ত উঠোন ভ'রে আলপনা — শ্যামলী, তোমার মা-ঠাকুমাও আলপনা দিতেন নিশ্চয়ই — তুমিও দিতে ? — বাঃ, এই ঠিক আছে, চমৎকার হাসিটি, নোড়ো না, ঠিক অমনি ক'রে থাকো — এইবার আস্তে একটু চাদরটা ঠেলে দাও পা দিয়ে — এই রে, আবার শক্ত হ'য়ে গেলো।'

নরম গলার আওয়াজ, খুব নরম কথা বলার ধরন, আদরের মতো। উনি ধৈর্য হারাননি, কোনো অসহিষ্ণুতার ভঙ্গিও করেননি। বলতে তো পারতেন, 'চ'লে যাও, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না —' কিন্তু আস্তে-আস্তে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, যেন তুকমন্ত্র প'ড়ে আমাকে বশ ক'রে নিলেন — যেমন কোনো শিশুর অসুখ করলে সান্ত্বনা দেন মা, তুইয়ে-বুইয়ে তেতো ওষুধ গেলান, মাথায় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে, গুনগুন গান ক'রে-ক'রে ঘুম পাড়ান — তেমনি। আমি বুঝি ও-সব কথা ওঁর জারিজুরি, সবই নিজের মনে বলা, অমনি ক'রে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছেন আমাকে, কিন্তু তবু — কথাগুলো শুনতে আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে ওঁর মুখে 'শ্যামলী' ডাক শুনতে। আমি ওঁর অর্ধেক কথাই বুঝি না অবশ্য — কিন্তু যা বলেন, যে-ভাবে বলেন, তা যেন একটা সুরের মতো ঘুরে বেড়ায় আমার চারদিকে, আমার মনে প'ড়ে যায় ছেলেবেলার কথা, যখন আমি সুখী, সরল, নিষ্পাপ ছিলাম, যখন জল হাওয়া গাছপালা জীবজন্তু সকলেই বন্ধু ছিলো আমার। আমি কোথায় আছি, কী-ভাবে আছি, তা ভুলে

গিয়ে মাঝে-মাঝে হঠাৎ তাকাই ওঁর দিকে — উনি হাসেন, আমিও একটু না-হেসে পারি না। 'এই রকম শামলা-শামলা গায়ের রংই খুঁজছিলাম।' — এদিকে আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমি 'কালো মেয়ে', আমাকে 'পার করা' সহজ হবে না — আর সত্যিও বাবাকে তিন বিঘে জমি বেচে দিতে হয়েছিলো আমার বিয়েতে পণ দেবার জন্য। ঐ 'শামলা-শামলা' কথাটা শুনেই হঠাৎ 'শ্যামলী' নাম বেরিয়ে গেলো আমার মুখ দিয়ে — মনে হ'লো ওটাই ঠিক, আমার পক্ষে মানানসই। 'ঠিকমতো মডেলও পেয়ে গিয়েছি —' তাহ'লে এমন-কোনো কাজ আছে যার পক্ষে আমি ··· বলতে গেলে শুধু আমিই যোগ্য? উনি প্যারিসে ছিলেন, শুনেছি সে-দেশে রূপসীর মেলা — কিন্তু সেখানে সকলেরই দুধে-আলতা রং, আর উনি কালো মেয়ে চান। কিন্তু আর কি কেউ আসেনি ওঁর বিজ্ঞাপন দেখে? শামলা-শামলা রঙের মেয়ের কি অভাব কলকাতায়? কেমন একটু গর্ব হ'লো আমার, মনের এক গোপন কোণে এই ধারণা উঁকি দিলো যে হয়তো কিছু আছে আমার চেহারায় যা সহজে পাওয়া যায় না, কোনো বৈশিষ্ট্য যা অন্য কেউ তা দেখতে পায়নি?

'তুমি তো মহাভারত পড়েছো, শ্যামলী, সত্যবতীকে মনে আছে? না? তাও তো বটে, ছোটোদের মহাভারতে আর কতটুকুই বা থাকে। ভীষ্মের বিমাতা, বিচিত্রবীর্যের মা, সত্যবতী। আর কার মা, বলো তো? বেদব্যাসের — যিনি চতুর্বেদ ভাগ করেছিলেন, পুরো মহাভারতটা মুখে-মুখে ব'লে গিয়েছিলেন

গণেশকে — সেই ব্যাসদেব। যাঁকে বলে 'দ্বৈপায়ন', 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন', যেহেতু তিনি দ্বীপে জন্মেছিলেন, আর গায়ের রং ছিলো ভীষণ কালো। মহাভারতের সেই অদ্ভুত চরিত্র, যিনি কোনো সাতে-পাঁচে নেই, দেখা দেন শুধু মাঝে-মাঝে, কোনো সংকটের সময়ে, ঠাকুর্দা-বাবা-ছেলে তিন পুরুষেরই যিনি সমবয়সী, আসলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের যিনি বাবা, যিনি কখনো যুবক ছিলেন ব'লে মনে হয় না, কখনো বৃদ্ধ হবেন ব'লে মনে হয় না — চঞ্চল সময়ের মধ্যে তিনি যেন একমাত্র স্থির। ব্যাসকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায় — কেন অমন ঘোর কালো তিনি, কেন তাঁর গায়ে অমন ভূত-ভাগানো দুর্গন্ধ (অথচ তাঁর মা সত্যবতীর গায়ের সুগন্ধে দশ দিক আমোদিত) — এ-সবের অর্থ কী? কিন্তু আপাতত তাঁর মায়ের কথাই বেশি ভাবছি আমি, বহুদিন ধ'রে ভাবছি, অত বড়ো মহাজ্ঞানী পুত্রের যিনি মা, তিনিও তো সহজ লোক নন। ব্যাসের কী ক'রে জন্ম হ'লো জানো তো?'

আমি মন দিয়ে শুনছি তাঁর কথা, তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে, থেমে-থেমে বলছেন আর কথার ফাঁকে-ফাঁকে দ্রুত আঙুল চলছে তাঁর, কোলে একটা বড়ো খাতা খোলা, পেন্সিলের এক-একটা টানের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত ঘুরছে গোল হ'য়ে, বাঁকা হ'য়ে, ওপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকে, মাঝে-মাঝে দেখছেন আমাকে, চোখোচোখি হচ্ছে। আমার কৌতূহল হ'লো উনি কী আঁকছেন তা দেখার জন্য, কিন্তু মাথা তুলতে গিয়ে চাদরটা

স'রে গেলো কাঁধ থেকে, তক্ষুনি আবার সচেতন হ'য়ে টেনে দিলাম। তিনি কিছু লক্ষ করলেন না।

'সত্যবতী, জেলের মেয়ে, যমুনায় খেয়া-পারাপার করেন। কুমারী তিনি তখন, সদ্যযুবতী, মৎস্যগন্ধা। একদিন পরাশর মুনি সেই খেয়ায় উঠলেন নদী পেরোবার জন্য। নৌকো যখন মাঝনদীতে, মেয়েটি তার সুন্দর শরীর দুলিয়ে-দুলিয়ে দাঁড় টানছে, মাথার ওপরে নীল আকাশ আর নীল যমুনায় মাছের আঁশের মতো চিকচিকে রোদ্দুর, তখন তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মুনি হঠাৎ বিহ্বল হলেন, নদীর চেয়েও অনেক বড়ো-বড়ো ঢেউ উঠতে লাগলো তাঁর দেহের মধ্যে। জানো তো সেকালের মুনিঋষিরা কেমন ছিলেন, কোনো ওজর-আপত্তি কানে তুলতেন না, যা চাই তা চাই-ই, তক্ষুনি, সেই মুহূর্তে। সত্যবতী যাতে লজ্জা না পান মুনি নামিয়ে আনলেন দিনে-দুপুরে ঘন কুয়াশা, চারদিক ঝাপসা হ'য়ে গেলো, আঁধার-মতো, রইলো শুধু সময়ের গর্ভে ঐ একটি গোপন নৌকো। এমনি ক'রে মিলন হ'লো কনকবর্ণ ব্রাহ্মণ মুনি আর অনার্য শ্যামাঙ্গী ধরণীকন্যার — জলের ওপরে, যে-জলে প্রথমে প্রাণ জন্ম নিয়েছিলো। মৃত্তিকার মেয়ে সত্যবতী, জলে তার জীবিকা, আর অন্যদিকে মনস্বী পরাশর — এমনি ক'রে ধ্যানের সঙ্গে লৌকিকের মিলন হ'লো। ভাবতে গেলে আদর্শ মিলন: দুই বিপরীতকে মিলিয়ে দেবার শক্তির নামই তো মহত্ত্ব। নদীর ওপারে উঠে মুনি বর দিলেন জেলেনিকে, তার গা থেকে মাছের দুর্গন্ধ দূর হ'য়ে গেলো, ছড়িয়ে পড়লো পদ্মের

সৌরভ চারদিকে। "যমুনার ঐ দ্বীপে তুমি আমার পুত্রকে জন্ম দেবে," এই ব'লে পরাশর চ'লে গেলেন। এই পুত্র ব্যাসদেব, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়েই জন্মালেন, আর জন্মানোমাত্র সাবালক হ'য়ে চ'লে গেলেন মা-কে ছেড়ে পিতার সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে। কিন্তু গায়ের রঙে ও দুর্গন্ধে রইলো তাঁর মাতৃকুলের চিহ্ন।

'আমি সেই মুহূর্তটির কথা ভাবি, যখন পরাশর চ'লে গেছেন, আর সত্যবতী একা প'ড়ে আছেন খেয়ানৌকোয়, যা একটু আগে তাঁর বাসরশয্যা হয়েছিলো। তিনি জানেন তাঁর গর্ভে এখন ভবিষ্যৎ, কিন্তু এটা কি জানেন সেই ভবিষ্যৎ কত বড়ো, কত মহৎ, কত আবহমান ঐশ্বর্যে ভরা? ও-সব কি ধারণা করতে পেরেছিলেন এই সামান্যা নারী, এই পার্থিবা? তাঁর জন্যে তো কোনো অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণী হয়নি, তিনি দ্যাখেননি কোনো অগ্রিম স্বপ্ন, কোনো দেবদূত দেখা দেননি তাঁকে। অন্য সব দিনের মতোই ছিলো সেই দিনটি তাঁর, নৌকো বাইছেন, রোজকার মতোই পারাপার করছে বেসাতি নিয়ে হাটের পসারি, তাঁতি, কুমোর, শাকসব্জির ঝুড়ি নিয়ে চাষি মেয়েরা। হঠাৎ কী হ'য়ে গেলো। কেমন লেগেছিলো তাঁর? কী মনে হয়েছিলো? এই প্রথম প্রণয়ের স্বাদে তখনও তাঁর দেহ কি ছিলো পুলকে ভরা? যে-সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিলো তাঁকে ঘিরে, তিনি কি বুঝেছিলেন সেটা তাঁরই শরীরের? না কি তিনি ভয় পেয়েছিলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে, সূর্যের সামনে কিশোরী কুন্তীর মতো? কী

ভাবছিলেন তিনি, কিছু কি ভেবেছিলেন? না কি প'ড়ে ছিলেন, অবশ, মোহাচ্ছন্ন, শুধু ঝড়ের পরে গাছের ডালপালার মতো ঈষৎ কেঁপে উঠছিলেন মাঝে-মাঝে? এ-সব কিছুই লেখা নেই মহাভারতে, এই আশ্চর্য ঘটনাটি বলা হয়েছে কেজো সুরে, অল্প কয়েকটি কথায়। আর সত্যবতীর পরবর্তী জীবন, যখন তিনি রাজা শান্তনুর মহিষী হয়েছেন — তা থেকে তাঁকে মনে হয় একজন সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মহিলা, তার বেশি আর-কিছু নয়। তাঁর অন্য দুই ছেলের মধ্যে একজন বাচ্চা বয়সেই ম'রে গেলো, আর একজন মরলো যক্ষ্মায়, সারাক্ষণ বৌয়েদের সঙ্গে লেপটে থাকার ফলে। পরে আর কখনো একটি সাধারণ সুপুত্রেরও মা হ'তে পারেননি তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে, জীবনে সেই একটিবার, তিনি প্রায় দেবী হ'য়ে উঠেছিলেন — অন্তত আমার তা-ই মনে হয় — নয়তো পরাশর তাঁকেই কেন বেছে নিলেন ব্যাসের জন্ম দেবার জন্য, আর কি কোনো মেয়ে ছিলো না আর্যাবর্তে? আমি সেই মুহূর্তটি ভাবি, আমি সেই মুহূর্তটিকে আঁকতে চাই।

'কী-রকম ভাবছি জানো? মুনি বর দিয়ে চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর তৈরি কুয়াশা তখনও কাটেনি। জল, ডাঙা, আকাশ তখনও প্রায় পরস্পরে মিশে আছে। ছবির চারদিক ঝাপসা, হঠাৎ একটি উজ্জ্বল অংশে দেখা যাচ্ছে শুধু একটি নৌকো — না, নৌকোর আভাস — আর পাটাতনের ওপরে, স্পষ্ট, যেন সে-মুহূর্তে পৃথিবীতে আর-কিছু নেই, এক নারী, উন্মোচিত, আকাশের তলায় নদীর মতো উন্মোচিত, যিনি

কিছুক্ষণ আগেও কুমারী ছিলেন, পরে আবার ঋষির বরে কুমারী হবেন, কিন্তু এ-মুহূর্তে যিনি পুরুষ-স্পৃষ্ট প্রকৃতি, সৃষ্টির উৎস। সুন্দর তাঁর শরীর, তা হ'তেই হবে, ঋষিরা কখনো কুরূপার গর্ভে জন্ম নেন না।) কিন্তু তাঁর মুখেব ভাবটি — আশা আনন্দ প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠায় মেশা — সেই ভাবটি এখনো ঠিক ধরা দিচ্ছে না আমাকে। কিন্তু আসবে, চেষ্টা করতে-করতেই পেয়ে যাবো, এক-এক সময় যেন ঝলক দিয়ে মিলিয়ে যায়। শরীরটি হবে শান্ত, সুখী অলস, যেন সে আছে ব'লেই সুখী, কেননা সে এইমাত্র জানতে পেরেছে সে শুধু উপযোগী নয়, সুন্দর। শরীর সুন্দর হ'য়েই সুখী হ'তে পারে, কিন্তু মনের লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। চিন্তা করে মন, উপলব্ধি করে মন, আর সেই মনের আয়না হ'লো মুখ। তাই সত্যবতীর শরীরে আর মুখে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ দেখতে পাচ্ছি, যেন একটা তর্ক চলছে শরীরের সঙ্গে মুখের, যেমন রেমব্রাণ্ট তাঁর বাথশিবার ছবিতে ফুটিয়েছিলেন। ঐ বাথশিবা, আর রুবেন্সের এঞ্জেলিকা — এই দুটি ছবির মধ্যে একটি চমৎকার সংলাপ আমি শুনতে পাই। রুবেন্স বলেছেন, ("দ্যাখো এই নগ্ন নারীকে, এই গোলাপি রঙের অসামান্য রূপসীকে, দ্যাখো এই ধরাধামে একটি স্বাস্থ্যবতী ভরপুর যুবতীর দেহ কত সুন্দর হ'তে পারে। কিন্তু সে এখন গাঢ় ঘুমে অচেতন, নিজেকে সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, তার রূপযৌবন এখন তাকে ছাড়িয়ে এক স্বাধীন সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। আর দ্যাখো এই গাল-ভাঙা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে, মেয়েটির গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে তিনি অবাক

হ'য়ে তাকিয়ে আছেন, ভয়ে, বিনয়ে, সম্ভ্রমে, অবিশ্বাসে — যেন ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন এমনি তাঁর মুখের ভাব — কিন্তু না, ঈশ্বর নন, ঐ পেছনের ছায়া থেকে এক খুদে শয়তান তাঁকে পাপের ভয় দেখাচ্ছে, অথচ তিনি পারছেন না ঐ রূপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে।") আর রেমব্রাণ্ট বলেন, "বাথশিবার শরীর সুন্দর, কিন্তু তার মুখে দ্যাখো বেদনা, ভাবনা, সে কোনো অর্থেই ঘুমিয়ে নেই।" কেন বাথশিবার মুখে ঐ বিষাদ? তার সুন্দর শরীরটিকে ভোগ করার জন্য রাজা দায়ুদ তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরেছিলেন, আর কি তার নিজের শরীরকে সে ভালোবাসতে পারে? অথচ দায়ুদ তাকে গ্রহণ না-করলে বিখ্যাত সলোমনেরও জন্ম হ'তো না — কী-রকম উল্টোপাল্টা সব ব্যাপার নিয়ে তার জীবন! কিন্তু রূবেন্সের সুন্দরীর মুখে এ-ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো ছায়া পড়েনি তাতে, তার নির্মল, মনোহীন রূপ যেন চারদিক আলো ক'রে আছে। রূবেন্স আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেন, রেমব্রাণ্ট আমাদের চিন্তা করতে বলেন। আমিও সেই ধরনের কিছু ভাবছি, আমি চাই যে সত্যবতীর মুখের ভাবটি হবে সচেতন, যেন সে বুঝতে পেরেছে তার জীবনে কয়েক মুহূর্ত আগে যা ঘ'টে গেলো তার সত্যিকার অর্থটা কী। এই তো একটি অলৌকিক মুহূর্ত তার জীবনের, এর পরেই তো তাকে হ'তে হবে এক সাধারণ নারী ও রাজমহিষী, যেমন বাথশিবাও পরে হয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত স্বামীকে, মুমূর্ষু দায়ুদের সঙ্গে

সম্পত্তি নিয়ে তর্কও করেছিলেন। আমি তোমার সাহায্য চাই, শ্যামলী, কেননা আপাতত, আমার চোখে, তুমিই সত্যবতী। তুমি কি পারবে না, আপাতত, নিজেকে একটু-একটু সত্যবতী ব'লে ভাবতে ; থিয়েটারে যেমন, কয়েক ঘণ্টার জন্য, আমাদের চেনাশোনা কোনো মহিলা সীতা বা শকুন্তলা হ'য়ে যান, তেমনি ? পারবে না কি সেই দৃশ্য, সেই ঘটনা, সেই মুহূর্তটি মনে-মনে ভেবে মনে-মনে সেইমতো হ'তে ? তোমার মন যদি একবার মেনে নেয় তাহ'লে তোমার শরীর আর আপত্তি করবে না।'

১৩

কখন যেন চনচনে খিদে পেয়েছিলো, এখন নেই, ভুলে গেছে। একটু ক্লান্ত, যেন ঝিম ধ'রে আছে শরীরে — কিন্তু বেশ ভালো, বোধহয় এই ভাবটাকেই 'পবিত্র' বলে। খুব ভালো নিয়ম, এই বিয়ের দিনে উপোস, মন স'রে আসে বাইরের সব ব্যাপার থেকে, সংসারের শরিক হবার পূর্বমুহূর্তে সংসারকে ভুলে থাকে কিছুক্ষণ, শুধু নিজেকে নিয়ে। তার অবশ্য পুরোনো, তবু — সেইজন্যেই — এমনি একটু নিভৃত সময়ের তার দরকার ছিলো। দুপুরবেলাটা তেতে উঠেছিলো, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে শীত পড়ি-পড়ি। পাখা বন্ধ ক'রে দিয়েছে কমলা, একটু শুয়েছে, তন্দ্রা, মাঝে-মাঝে ঝাপসা, কিন্তু ঘুম

নয়। বাঁকা আকাশ জানলার বাইরে, হলদে রোদে ফ্যাকাশে নীল: বিকেল হ'য়ে এলো। বিকেল: ঘরের মধ্যেও আলোর তেমন জোর নেই আর, দেয়ালের শাদা কোথাও-কোথাও ছাইরঙা। কিন্তু সেই ঘর সারাক্ষণ একরকম। উনি পর্দা টেনে দিয়েছেন উত্তরের জানলায়, সারা ঘরে শুধু টিউবের বাতির নকল রোদ, নীলচে শাদা, স্থির — বৃদ্ধি ক্ষয় বদল নেই। আমি আসি যখন, আবার যখন বেরিয়ে যাই — কখনো রোদ কখনো মেঘ কখনো তাপ কখনো ভেজা, কোনোদিন বাস্-এ বসতে পাই কোনোদিন পাই না। কিন্তু সেখানে, ঐ ঘরে, কিছু নেই যা সাময়িক বা অস্থায়ী বা অনিশ্চিত। বৃষ্টি রোদ শীত গ্রীষ্ম দুপুর সন্ধ্যা — সব হারিয়ে গেছে। ঋতুর বাইরে, বেলা-অবেলার বাইরে, এমনকি আমরা যাকে জীবন বলি তারও বাইরে যেন: এক মায়ালোক। উনি ঠাণ্ডাই যন্ত্র বসিয়েছেন, একটা সুগন্ধি ঠাণ্ডা জড়িয়ে ধরে ঢোকামাত্র, বাইরের কোনো শব্দ নেই, পায়ের শব্দটুকুও ডুবে যায় গালিচায়। এখন আর বেশি কথা বলেন না উনি, কিন্তু ঘরের কোথাও বোধহয় রেডিওগ্রাম চলে — নরম, খুব নরম হ'য়ে ভেসে বেড়ায় সুর, ঘুরে-ঘুরে, কখনো শোনা যায় কি যায় না, কখনো হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটের মতো — শুনতে-শুনতে আমি যেন আরো গভীরে ডুবে যাই, ঐ নরম, গভীর মেরুনরঙের সোফাটার মধ্যে। অনেক যন্ত্র, অদ্ভুত, বিলেতি, আগে কখনো ও-রকম বাজনা শুনিনি। শুনতে কিন্তু ভালোই লাগে, যেন মনের ওপর সুগন্ধের মতো, যেন টুপটুপ শিউলি আর শিশির

ঝ'রে-ঝ'রে আশ্বিনের ভোর হচ্ছে — ঘুরে বেড়ায় স্থব, আমাকে ঘিরে-ঘিরে, আমাকে আদর ক'রে। এই মায়ালোক : এটা দু-ঘণ্টার জন্যে আমারও। তুমি, কমলা — মানে, শ্যামলী — তুমিও এখানে প্রতিদিন একরকম। নীল শাড়ি খয়েরি শাড়ি হলুদ শাড়ি, আলো ছায়া রোদ্দুর মেঘ, যাতে চেহারার কিছুটা উনিশ-বিশ হ'য়ে যায় (কখনো কারো ভালো লাগে বা লাগে না), সে-সব দৈব তোমাকে ছুঁতে পারে না এখানে, এখানে সাজগোজের বাইরে তোমার পরিচয়, যেমনটি তুমি ঠিক তা-ই, অবিকল, এক, ভোল-বদল নেই। তুমি 'সহজ' হয়েছো — তার মানে, ভুলে গিয়েছো নিজেকে, এসেছো বহুকালের খোলশ থেকে বেরিয়ে — নিজেরই মধ্য থেকে বলা যায় — তোমার যে একটা শরীর আছে এই চেতনা আর কষ্ট দিচ্ছে না তোমাকে। মিনিটের পর মিনিট : ফোঁটা-ফোঁটা শিশির, শিউলি, ঘন সবুজ দূর্বার গায়ে শিশির, উজ্জ্বল জল, শিউলির স্থবাস, প্রথম নরম ভোরবেলার আলো। কিছু করার নেই তোমার, ভাবার নেই, তোমাকে শুধু তুমি হ'তে হবে, পুরোপুরি — তুমি যে আছো তা-ই যথেষ্ট। তোমাকে সত্যবতী হ'তে হবে, তুমি একটু-একটু ক'রে সত্যবতী হ'য়ে উঠছো — শুধু চুপ ক'রে থাকো, নিজেকে এলিয়ে দাও, ধরা দাও এই মায়ায়। আধ ঘণ্টা পর-পর কয়েক মিনিট বিশ্রাম কমলার পাওনা — তখন সে উঠে বসে (উনি একটা পা-পর্যন্ত-পড়া আলখাল্লার মতো জামা দিয়েছেন সেইটি গায়ে জড়িয়ে), আড়মোড়া ভাঙে, একটু দাঁড়িয়ে নেয় বা দু-চার পা হাঁটে —

বা কখনো শুয়ে থাকে একই ভাবে, চুপচাপ। চারটে বাজামাত্র ছুটি তার, উনি তাকে এক মিনিটও বেশি থাকতে বলেন না, পঞ্চাশটি টাকা হাতে-হাতে দিয়ে দেন — তাতে কেমন অপমান লাগে কমলার, একদিনও কি এমন হ'তে নেই যে একটু বেশিক্ষণ তাঁর দরকার হ'লো তাকে, বা — আর্টিস্ট মানুষ, শুনেছে খুব ভুলো মনের লোক হন তাঁরা — কখনো কি টাকা দিতে ভুল হ'তে পারে না? কমলা সেজে-গুজে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে দ্যাখে, লম্বা নিচু কাচ-বসানো টেবিলটার ওপর চা তৈরি, তাই তাকে আর-একটু বসতে হয়, ঐ এক পেয়ালা চা আর দুটো বিস্কুটও তার রোজগার। উনি নিজেই চা ঢেলে দেন, তাতে লজ্জা করে কমলার; সে মেয়ে, এ-সব তারই কাজ, একদিন মুখ ফুটে ব'লেই ফেললো, 'আমি ঢালবো চা?' 'বেশ, আমাকে একটু পাৎলা দেবেন, দুধ চাই না, আধ চামচে চিনি।' (এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, ছবির কাজ যতক্ষণ চলে ততক্ষণ 'তুমি' ছাড়া কিছু বলেন না, কিন্তু তারপরেই সে 'আপনি' হ'য়ে যায়, একজন অল্প-চেনা, প্রায় না-চেনা মানুষ, তাঁর চোখের দৃষ্টিও বদলে যায় তখন।) এক-একদিন চা খেতে-খেতে গুম হ'য়ে থাকেন, ভুরু কুঁচকে, কোনো-একটা পত্রিকা হাতে নিয়েই সরিয়ে রাখেন হয়তো, মাঝে-মাঝে ঠোঁট নড়ে কিন্তু আওয়াজ বেরোয় না, তাকে বিদায় দেন দরজার ধারে শুধু নিঃশব্দে একটু মাথা নেড়ে। অর্থাৎ, সেদিন কাজ তেমন এগোয়নি, বা পছন্দ হয়নি, মেজাজ ভালো নেই। আবার কোনো-কোনোদিন, কাজ

মনোমতো হ'লে, তিনি সিগারেট ধরিয়ে হেলান দেন চেয়ারে, এক্-আধটু আলাপও করেন তার সঙ্গে, তাকে সিঁড়ির মাথা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, পরশু আবার দেখা হচ্ছে তাহ'লে।' এ-রকম দিনে কমলা সাহস পেয়ে তাঁকেও দু-একটা কথা জিগেস করে। 'এত ছবি — সব আপনার আঁকা?' 'হ্যাঁ, প্রায় তা-ই।' 'নিশ্চয়ই আরো অনেক ছবি আছে আপনার?' 'তা আছে।' 'আপনি কি সারাদিন ধ'রে আঁকেন শুধু?' 'তা, একরকম তা-ই। মাঝে-মাঝে একটু পড়ি, রেকর্ড শুনি, কিন্তু ছবি আঁকাই আমার কাজ। আর-কিছু করি না।' 'বেরোন না কখনো?' 'দিনে দু-বার বেরোতেই হয় — খাবার জন্য।' 'এখানে রান্নার ব্যবস্থা নেই বুঝি?' 'আছে, কিন্তু আমি তো হাজার হোক বাঙালি মায়ের ছেলে, রাঁধতে শিখিনি। তার তাতে সময়ও নষ্ট।' 'রোজ বাইরে খেতে ভালো লাগে আপনার?' 'তা মন্দ কী। বহুদিন প্যারিসে কাটিয়ে ওটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে।' 'আপনার কেউ নেই কলকাতায় — আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব?' 'নেই তা নয়, তবে — ঐ আরকি।' 'আপনার বাঙালি রান্না খেতে ইচ্ছে করে না?' 'করে বইকি, কিন্তু এ-পাড়ায় কোথায় পাবো মাছের-ঝোল-ভাত?' 'আমি আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি না, কিন্তু বলেন তো একদিন অন্য সময়ে এসে —' 'না, না, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমার জন্য? আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।' 'আমি বাড়ি থেকেও রেঁধে আনতে পারি —' এই কথাটা বেধে যায় কমলার মুখে, আরো

অনেক কথা ঠোঁটের কাছে মিলিয়ে যায়। এই আলাপ — একে কি আর আলাপ বলে! 'কেউ নেই তা নয়, তবে — ঐ আরকি —' এমনি সবটাতেই — আধখানা ব'লে চেপে যাওয়া, যেটুকু না-বললে অভদ্রতা হয় ঠিক সেটুকুই, তার বেশি কিছু না, ভাবটা যেন তোমাকে মডেল করেছি ব'লে কি গল্প করা যায় তোমার সঙ্গে! মাঝে-মাঝে হাসেন — কিন্তু সব সময় ভাবটা যেন কোনো শিশুর অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সে মনে ব্যথা পায়, তা বোঝেন না পর্যন্ত। কত কিছু জানতে ইচ্ছে করে কমলার, প্যারিস শহর কেমন, কেমন সেখানকার খাওয়াদাওয়া, বাড়ি-ঘরদোর, লোকেরা, মেয়েরা, কেন তিনি অত দূরে চ'লে গেলেন নিজের দেশ আত্মীয়স্বজন সকলকে ছেড়ে, মা-বাবা বোধহয় নেই, কিন্তু ভাই-বোন? অন্য একটি কথা জানার জন্য ম'রে যাচ্ছে কমলা — তিনি কি বিয়ে করেছেন? করেছিলেন কখনো? বিপত্নীক? বাঙালি বৌকে ত্যাগ করেছেন? মেম-বৌয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে? স্ত্রীকে সঙ্গে আনেননি বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু — কোন দেশের মেয়ে তিনি? নিশ্চয়ই অসাধারণ সুন্দরী? এমন-কিছু কথা নয়, যা জিগেস করাটা বেয়াদপি — বিয়েতে তো আর চোরাম-চোরাম নেই কিছু, কিন্তু না, মুখে আনতে পারে না, লজ্জা পায়, যেন ভয় করে, সময়ও পায় না, তার কোনো-একটা কথার মধ্যিখানেই হঠাৎ 'আচ্ছা —' ব'লে উঠে পড়েন তিনি, দরজার ধার থেকে কমলা বোঝে তাঁর মন প'ড়ে আছে ছবিটাতেই, এক্ষুনি আবার ইজেলের সামনে দাঁড়াবেন

রং তুলি নিয়ে, সেই একই জায়গায়, একই ঘরে, একই আলোয় — থাকবে না শুধু সে, শ্যামলী — মানে, কমলা। হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল উঠে যায়, খোলা দরজায় খিল পড়ে। অথচ এই মানুষই, সে যখন লজ্জায় ম'রে যাচ্ছিলো, চোখ মেলে তাকাতে পারছিলো না, কত মন-ভোলানো স্তবচন তাকে শুনিয়েছিলেন — অর্ধ-কালী, দশমীর জ্যোছনা, সত্যবতী — আরো কত কী, যার প্রায় কিছুই সে মনে রাখতে পারেনি, যদিও তখন কেমন মুগ্ধ হ'য়ে শুনে গিয়েছিলো। বুজরুকি, ধাপ্পা, নিজের কাজ হাসিল করার ফন্দি। স্বার্থপর!

১৪

চারটের পরে রাস্তায় যখন বেরোয়, প্রথমে একটা গরমের ঝাপট লাগে কমলার গায়ে, রোদ্দুরে চোখের পাতা মিটমিট করে কয়েকবার। দু-এক মুহূর্ত যেন চিনতে পারে না চৌরঙ্গি রাস্তাটাকে। তারপর হঠাৎ তার পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাস্তব জগৎ, ছুটে গিয়ে বাস্ ধরে সে, বাড়ি ফিরে অবনীর জন্য খাবার তৈরি করতে লেগে যায়। আবার সংসার, আবার স্বস্তি। কিন্তু অস্বস্তিও নেই তা নয়। কী ভালোই না হ'তো, যদি সে সব বলতে পারতো অবনীকে, যদি টাকাগুলো দিতে পারতো তার হাতে এনে, মাঝে-মাঝে দু-জনে মিলে কিছু ওড়াতে পারতো। কিন্তু না — শুরুতে যখন বলেনি,

তখন এইভাবেই চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। টাকা নিয়ে কয়েকদিন বেশ ভাবনা গেছে তার, প্রথমে একটা ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলো, এখন পাড়ার পোস্টাপিশে রাখছে। অল্পস্বল্প মিশিয়ে দেয় সংসারের টাকার সঙ্গে, চোখে পড়ার মতো নয় সেটা — কিন্তু সে যে ভেবেছিলো নিজে উপার্জন ক'রে অবনীর ভার লাঘব করবে, তা আর হ'য়ে উঠছে কোথায়। আর, যত দিন যাচ্ছে, ততই এই টাকা ব্যাপারটা গৌণ হ'য়ে যাচ্ছে তার কাছে, তার লজ্জা করে আলোক পাল যখন নির্ভুলভাবে একটি এনভেলাপ বাড়িয়ে দেন তার দিকে, এ নিয়ে কী করবে তা ভেবে পায় না। মাঝে-মাঝে ছোটো-খাটো উপহার নিয়ে যায় অবনীর জন্য — অবনী যা খেতে ভালোবাসে এমন-কিছু, এক টিন ত্রিপুরার আনারস হয়তো, বা খাঁটি দার্জিলিং-চায়ের প্যাকেট; আর অবনী যদি মৃদু প্রতিবাদ করে তক্ষুনি বলে, 'তুমি খরচের জন্য ভেবো না, আমি ঠিক চালিয়ে নেবো।' একদিন ঝোঁকের মাথায় একটা ফাউন্টেনপেন এনেছিলো। অবনী লিখে দেখে বললো, 'বাঃ, চমৎকার তো। তুমি কিনে আনলে?' 'আজ একবার পারুলের কাছে গিয়েছিলাম — তোমাকে বলেছিলাম, মনে নেই? আমার ছেলেবেলার বন্ধু — ? হঠাৎ এক দোকানে কলমটা দেখে পছন্দ হ'য়ে গেলো।' 'কত দাম নিলো?' এক মুহূর্ত দেরি ক'রে সে জবাব দিলো, 'চেয়েছিলো দশ, আমি দরাদরি ক'রে পাঁচ টাকায় আনলাম।' 'আশ্চর্য! পাঁচ টাকায় এই কলম! ফুটপাতে ফেরি করছিলো বুঝি?' 'হ্যাঁ, রাসবিহারীর মোড়ে।'

(আসলে চৌরঙ্গির একটা ছোটো দোকানে পঁচিশ টাকায় কিনেছিলো।) অবনী বললো, 'চোরাই মাল নয় তো? কে জানে কোন পকেটমারের কীর্তি।' 'তুমি বলছিলে তোমার কলমটায় আর লেখা পড়ছে না, তাই ভাবলাম — তুমি কি রাগ করলে এ-জন্য?' 'বাঃ, এতে রাগের কী আছে, আমার তো লাভই হ'লো, যার চুরি গেছে তাকে তো আর ফেরৎ দেয়া যাচ্ছে না। তা তুমি একজন বন্ধু পেয়ে গেলে কাছাকাছি, খুব ভালো হ'লো। সারাদিন একা-একা এই বাড়িতে — নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে তোমার?' 'এতে আর খারাপ লাগার কী আছে, আজকাল অনেক সংসারই তো শুধু স্বামী-স্ত্রীর।' 'কিন্তু সকলেরই অন্যেরা থাকে আশে-পাশে।' এর উত্তরে কমলা বললো, 'আমি আর কাউকে চাই না, তুমি থাকলেই যথেষ্ট।'

মিথ্যা — কপটতা — প্রতারণা! প্রতিদিন আমি ঠকাচ্ছি অবনীকে, যে-অবনী এত ভালো, এত বিশ্বাসপরায়ণ, এত ভালোবাসে আমাকে। আমি একটা কী? আমি অন্যায় করছি, আমার পাপ হচ্ছে। অবনী আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব; সে কল্পনা করতে পারে না যে আমি তাকে লুকিয়ে এই কাজ করছি, স্পষ্টত তার মতের বিরুদ্ধে, তার অবাধ্যতা ক'রে। যদি সে ঘুণাক্ষরে কখনো টের পায় তাহ'লে কি ক্ষমা করতে পারবে আমাকে? তাহ'লে কি সেই মুহূর্তেই সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না, যেখান থেকে সে আমাকে কুড়িয়ে নিয়েছিলো সেই জঞ্জালের স্তূপে? যদি এমন হয় যে

একদিন সদর স্ট্রিটের মোড়েই দেখা হ'য়ে গেলো তার সঙ্গে আমার? যদি এমন হয় সে তার নিজের কাজে দেখা করতে এলো আলোক পালের সঙ্গে, আমি সিঁড়িতে তার মুখোমুখি প'ড়ে গেলাম? কী হবে তাহ'লে? তখন আমি সব বুঝিয়ে বলবো তাকে, পায়ে পড়বো, কাঁদবো — আমার কান্না দেখে, কষ্ট দেখে সে ভুলে যাবে। আর সত্যি বলতে, আমি তো অবনীর পাওনার এক কণাও অন্যকে দিচ্ছি না, উনি তো একটি আঙুলের ডগা দিয়েও ছোঁননি আমাকে — অবনীর প্রতি যা-কিছু আমার কর্তব্য সবই আমি ক'রে যাচ্ছি। যদি তার কোনো ক্ষতি না হয়, যদি তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক থাকে, তাহ'লে এটা দোষের হবে কেন? আর তাছাড়া — এই ছবি, মডেল, আর্টিস্ট, এ-সব মন্ত্র অবনীই দিয়েছিলো আমার কানে; সে-ও আর্টিস্ট হ'তে চাচ্ছে, অথচ এ-ব্যাপারে আমাকে যদি বাধা দেয় তাহ'লে তারই বা কাজে আর ব্যবহারে মিল কোথায়?

মাঝে-মাঝে কমলা ভাবে, সে বোধহয় বড্ড বেশি সাহস করছে, তার ছেড়ে দেয়াই উচিত, এক্ষুনি, কাল থেকেই।... আচ্ছা, আর একটা দিন দেখা যাক, তারপর না-হয় ওঁকে ব'লে, বুঝিয়ে, কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। ওঁর কাছে সে নাম ভাঁড়িয়েছে, কোনো ঠিকানা দেয়নি, উনিও তাকে বিশ্বাস করেছেন, ওঁর প্রতিও কিছু দায়িত্ব আছে তার। কিন্তু একদিনও মুখ ফুটে কিছু বলা হয় না; মনেও থাকে না, সত্যি বলতে। সোম, বুধ, শুক্কুর — সপ্তাহের এই তিনদিন তার মন যেন

সকাল থেকে উতলা, আড়চোখে ঘড়ি দ্যাখে বার-বার, অবনী তার সময়মতো বেরিয়ে যায়, কমলার অবাক লাগে যে এতক্ষণে মাত্র সাড়ে-এগারোটা ··· পৌনে বারোটা। তারপর, একটু যত্ন নিয়ে সেজে, অবনীর দেয়া তিনখানা ভালো শাড়ির একখানা প'রে, অবনীর দেয়া ব্যাগটি হাতে নিয়ে, গুটিগুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম ধরে কমলা। সেই ঘর যেন চুম্বকের মতো টানে তাকে, আর সেখানে ঢোকামাত্র — সেই দু-ঘণ্টা ক'রে সময় — সে সব ভুলে যায়, নিজেকে সুদ্ধু ভুলে যায়। কেমন-একটা ঘোর নামে যেন, সুরে আর সুগন্ধে মেশা, কোনো ভাবনা নেই তার, কোনো কষ্ট নেই, নদীর ওপরে নৌকোর মতো এই সোফাটা, তাকে কুয়াশার মতো ঘিরে আছে সুর, জলের তলায় মাছের মতো সে নির্মল। দুলছে নৌকো খুব আস্তে যমুনার জলে, একটু-একটু কেঁপে উঠছে সে, ঝড় হ'য়ে যাবার পরে গাছের ডালপালার মতো। মুনি তাকে ছেড়ে চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর তৈরি কুয়াশা এখনো কাটেনি। কে? সত্যবতী। অনেক, অনেক আগেকার কথা, এক গল্প-কথা, বানানো। না — আজকের — এই মুহূর্তের — গল্প নয়, সত্যি। এখনো সেই কুয়াশা কাটেনি। সব ঝাপসা, শুধু সময়ের গর্ভে গোপন এক নৌকো, আর নৌকোর ওপরে — স্পষ্ট, উজ্জ্বল — কমলা নয়, শ্যামলীও নয় — সত্যবতী। না — সত্যবতী নয়, শ্যামলী — শ্যামলী নয়, কমলা। কেমন হবে মুখের ভাবটি তার? কোন আশা, কোন উৎকণ্ঠা, কোন রহস্য ফুটবে সেখানে — সেই আশ্চর্য

মুহূর্তটিতে, যখন সে বুঝতে পারছে না কী হ'লো, কী হ'তে চলেছে, হঠাৎ এই পদ্মফুলের গন্ধই বা কেন। এ কি তবে আমারই দেহের সুবাস, যা ঘুরছে আমাকে ঘিরে-ঘিরে, আদরের মতো ; এ কি তবে আমারই মনের তন্দ্রা — যা ঝ'রে পড়ছে, খুব মৃদু, খুব কোমল, দূর-থেকে-শোনা ঝিমঝিম ঝর্নার মতো, সুর হ'য়ে ? কুয়াশা পেরিয়ে কতদূরে তার বাবার বাড়ি, বাবা জাল নিয়ে নদীতে যাচ্ছেন, কাঁধে চাদর ফেলে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছেন, মাদারিপুর, উঠোনে সেই হলদে কুকুরটা, মা কুটনো কুটছেন রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে, ঠাকুমা স্নান সেরে এলেন তামার ঘটিতে পুজোর জল নিয়ে, বলাই কোত্থেকে ছুটে এসে বলছে, 'দ্যাখো দিদি, কী কচি তালশাঁস !' জলে ডুবে মরেনি বলাই, কেউ মরেনি, হারিয়ে যায়নি, সব ঠিক আছে। সে পারে, ইচ্ছে করলেই পারে সেখানে ফিরে যেতে, তার ছেলেবেলায়, সেই নদীর ধারে সবুজ গাছপালার মধ্যে — কিন্তু না, আমাকে একটু সময় দাও, এটা অন্য এক নদী, এই নৌকো আর কুয়াশা এখন আমারই জন্য, আমি এদের ছাড়তে পারি না। তোমরা ভালো থেকো, আমি তোমাদের ভুলিনি।

মিনিটের পর মিনিট : সে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে দ্যাখে। তেকোনা ছাঁদের মুখ, টান, গম্ভীর, কখনো বা মূর্তির মতো নিশ্চল, আবার কখনো ঠোঁটের কোণে হাসি — আর তুলি-ধরা হাতের বড়ো-বড়ো জোরালো ভঙ্গি, ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে, আড়াআড়ি, কোনাকুনি, যেন যুদ্ধ চলছে অদৃশ্য কোনো শত্রুর সঙ্গে। মাঝে-মাঝে থামেন,

কপালে রেখা পড়ে, পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে যেন দোলেন একটু, পেছিয়ে যান, এগিয়ে আসেন, অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি করেন — আবার কখনো তাঁর ডান হাত ছাড়া কিছুই নড়ে না। আর তাঁর দৃষ্টি — কী তীক্ষ্ণ, যেন বুকের মধ্যিখান দিয়ে ফুঁড়ে যাবে আমাকে। মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হাতটি অলস হ'য়ে ঝুলে থাকে, আস্তে-আস্তে ছোটো হ'য়ে যায় চোখ, প্রায় বুজে যায়, জেগে থাকে শুধু আলপিনের মাথার মতো দুটি ঝকঝকে বিন্দু, একবার আমার দিকে, একবার ছবির দিকে, একটু পরে সম্পূর্ণ বড়ো হ'য়ে খুলে যায়, তারপর হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পায় তুলি-ধরা হাতটা, লাফিয়ে উঠে ছোবল মারে ক্যানভাসে। কিছু-একটা জন্ম নিচ্ছে, কিছু-একটা হ'য়ে উঠছে — এক মুনি আর এক জেলের মেয়েকে নিয়ে, এই জগৎ-হারানো নির্জনতায়। আমি বেরিয়ে এসেছি আবরণ থেকে, নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি — আমি এখন অন্য কেউ, লজ্জার অতীত, ভালো-মন্দের বাইরে। আমার কোনো অসুবিধে নেই আর। জলের তলায় মাছের মতো আমি নির্মল, আকাশে ওড়া পাখির মতো আমি স্বাধীন। উনি যেদিকে তাকাতে বলেন তাকাই, যে-ভাবে থাকতে বলেন থাকি। কিন্তু যখনই তাঁর চোখে চোখ পড়ে মনে হয় তিনি আমাকে পেরিয়ে অন্য কিছু দেখছেন; যাকে তিনি খুঁজছেন ঐ ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে, সে যেন লুকিয়ে আছে কোনো দেয়ালের কোণে, পর্দার ভাঁজে — কিংবা যেন দেয়াল-টেয়াল কিছু নেই আর, ধু-ধু দূরে দৃষ্টির তীর ছুঁড়ে

দিয়েছেন। কখনো বা তাঁর চোখ দেখে মনে হয় তাঁর ঘুম পেয়েছে, তাঁর সামনে যা-কিছু আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছেন। অনেক সময় তুলি নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে দ্যাখেন আমাকে, বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ ক'রে ; আবাব কখনো যেন ভুলে থাকেন আমার অস্তিত্ব, আমি দেখতে পাই শুধু তাঁর মুখের আধখানা, আর হাতের ভঙ্গি। কিন্তু — তিনি যা-ই করুন — আমার মন একই রকম আচ্ছন্ন, আমার নৌকো একই ভাবে দুলছে, তেমনি সুর, তেমনি সুবাস — যতক্ষণ না চারটে বাজে, আর আমি আবার ফিরে পাই আমার শায়া শাড়ি ব্লাউজ, ফিরে যাই আমার সাধারণ সাংসারিক আমিত্বে।

১৫

যেদিন তাকে সদর স্ট্রিটে যেতে হয় না, সে-দিনটা কেমন ফাঁকা লাগে কমলার। মাঝে-মাঝে সেই মস্ত মোটা বইগুলোর পাতা ওল্টায়, যা থেকে অবনী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলো কাকে বলে 'সত্যিকার' ছবি। ইংরেজি লেখা প'ড়ে ওঠার মতো বিদ্যে অবশ্য তার নেই, কিন্তু ছবি দেখে-দেখেই বেশ সময় কাটে, বার-বার দেখেও পুরোনো মনে হয় না, কখনো এমন-কিছু চোখে প'ড়ে যায়, যা আগে লক্ষ করেনি। আর ছবির ঐ মেয়েরা — যদিও অন্য দেশের, বহু

দূর দেশের, কমলার সঙ্গে জাতে গোত্রে কিছুই মেলে না, তবু যেন তাদের সঙ্গে এক ধরনের আলাপ চলে তার, একটা গোপন কানাকানির মতো। হঠাৎ একদিন ওরই একটা বইয়ের ভেতর থেকে অন্য একটা ছবি বেরিয়ে পড়লো — চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না, তারই ছবি, অবনীর আঁকা। তখন তারা সবেমাত্র হাজরা রোড থেকে টালিগঞ্জে উঠে এসেছে ; থোকে কিছু টাকা পেয়ে অবনী তার জন্য কিনে এনেছিলো একখানা তুঁতে রঙের সিল্কের শাড়ি, আর একটা নকল পাথরের মালা, তাকে জোব করেছিলো তখনই ও-সব পরার জন্য। 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। একটু বোসো তো চুপ ক'রে, তোমার একটা পোর্ট্রেট আঁকি।' — কিন্তু খানিক পরে অন্য এক জোয়ারে তারা ভেসে গিয়েছিলো — সুখ, ভালোবাসার সুখ, শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার সুখ।

ছবিটা অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলো কমলা, অবনীর দাড়ি কামাবার গোল আয়নাটা হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখলো নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য মিল, কার ছবি তা ব'লে দিতে হয় না — যদিও আধ ঘণ্টার বেশি সময় হয়তো দেয়নি অবনী। হঠাৎ কমলার মনে হ'লো অবনী যেন আর ছবির কথা বেশি বলে না আজকাল, কেমন বিমনা হ'য়ে থাকে, চিন্তিত। না কি আমিই আর তেমন মন দিচ্ছি না তার দিকে? সেদিন আমি খুব যত্ন ক'রে ঘর গোছালাম, একটি নতুন সুজনি পেতে দিলাম তক্তাপোশে, বিকেল পড়তে নিজে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে পরলাম সেই তুঁতে রঙের শাড়ি আর নকল পাথরের মালাটি।

ক্লান্ত চেহারা নিয়ে ফিরে এলো অবনী, এক পলক তাকিয়ে বললো, 'বেরিয়েছিলে নাকি?' 'না তো। বেরোবো কোথায়। আজ একটা জিনিশ খুঁজে পেয়েছি, জানো। এই দ্যাখো।' 'ও, সেইটে?' প্রথমে একটু উদাসভাবে ছবিটায় চোখ ফেললো সে, পরমুহূর্তে ভালো ক'রে তাকালো আমার দিকে, তারপর ছবিটা হাতে নিয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। আমি বললাম, 'ছবিটা খুব জীবন্ত হয়েছে, তা-ই না? আমি হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিলাম। সত্যি — কী চমৎকার আঁকো তুমি!' 'না, না,' অবনী ছবিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো, 'এটা ঠিক হয়নি, আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম, অন্যভাবে আঁকতে চেয়েছিলাম।' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'কেন ঠিক হয়নি বুঝিয়ে দাও। আমার তো খুব ভালো লাগছে।' 'কী আশ্চর্য — ওটা তোমার ছবি হয়নি, শাড়ির ছবি হয়েছে — তাও বোঝো না? অমন হেলাফেলা ক'রে কি আর ছবি হয়! একদিন, দেখো, তোমার এমন একটা পোর্ট্রেট আঁকবো — কিন্তু সময় লাগে, ও-সবে বড্ড সময় লাগে — সত্যি, কী-ভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে আমার — নাঃ, এ-সব বাজে কাজ আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।' 'তা-ই দাও, অবনী, সব ছেড়ে দাও, টাকার কথা ভেবো না, আমার কথা ভেবো না, তোমার প্রাণ যা চায় তা-ই করো।' আমার গলার তীব্র সুরে অবনী যেন একটু অবাক হ'লো, ঝাপসা হেসে জবাব দিলো, 'কী যে বলো! তোমার কথা ভাববো না তা কি হ'তে পারে?' একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য রকম

গলায় বললো, 'শোনো, কমলা, একটা কথা আছে। ওদিকে আমার মা এক মুশকিলে ফেলেছেন আমাকে।' 'কী-রকম?' 'আমার খুড়োমশাই নাকি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করেছেন আমার জন্য। আর তাছাড়া—' অবনীর গলায় বিদ্রূপ ফুটলো এবার — 'আমার জন্য একটি মেয়েও দেখেছেন তাঁরা — একেবারে চমৎকা-র পাত্রী!' আমি অবাক হ'য়ে গেলাম যে শেষের কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠলো না, শান্তভাবে বললাম, 'তাঁদের দিক থেকে ঠিক কাজই করেছেন।' 'আশ্চর্য! ওঁরা কি এখনো ভাবেন আমি ওঁদের হাতের পুতুল? সে জন্যেই কি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি? আমি মা-কে সাফ ব'লে দিয়েছি আমার পাত্রী আমি নিজেই ঠিক করেছি, তাঁরা যেন ও নিয়ে মাথা না ঘামান। সব বলিনি এখনো, কিন্তু আর বেশি দেরি করাও চলবে না। একটা যুদ্ধ চালাতে হবে আমাকে, তারই জন্য মনে-মনে তৈরি হচ্ছি। যদি তাঁরা কিছুতেই তোমাকে ঘরে না নেন, জীবনে আর ও-মুখো হবো না! চাকরি দিয়ে ওঁরা লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে, কিন্তু—' হঠাৎ থেমে গেলো অবনী, একটু নিচু গলায় বললো, 'চাকরিটা এক পাব্লিসিটি ফার্মে, খোদ কর্তা আবার কাকার মক্কেল। সাড়ে-সাতশোতে শুরু। তাই ভাবছিলাম। — কিন্তু আবার সেই বিজ্ঞাপনের ছবি! না, কিছুতেই না! তার ওপর আবার কাকার সুপারিশে, যে-কাকা আমাকে — কিছুতেই না! আমাকে মনস্থির করতে হবে, মনস্থির করতে হবে।' আমি উঠে গিয়ে চা আর

খাবার নিয়ে এলাম; অবনীর ওপর একটা নতুন ধরনের মমতা জাগলো আমার মনে, তার মন হালকা করার জন্য বললাম, 'চলো আজ রাত্রে একটা ফিল্ম দেখে আসি।'

পরের দিন আমি যখন সদর স্ট্রিটে পৌঁছলাম তখন দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বেয়ারা বললে সাহাব আভি আয়েগা, আমাকে স্টুডিও খুলে দিলো। ঐ মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা সুন্দর ঘরটায় এই প্রথম একলা আমি। আমার কৌতূহল হ'লো ঘুরে-ঘুরে একটু দেখি। বড়ো ছবি, যেটা আঁকছেন এখন, সেটাতে ঢাকনা পরানো আছে — কাজ থামানোমাত্র ওটাকে ঢেকে দেন উনি, কেমন-একটা হিংসেব ভাব, বুড়ো স্বামী যেমন যুবতী স্ত্রীকে লুকিয়ে রাখে, তেমনি। দেয়াল-বরাবব লম্বা টেবিলে অনেক বই আর কাগজপত্রের স্তূপ, আমি সেখানে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপব, ঠিক আমার চোখের সামনে, এক তাড়া ছবি। স্কেচ, মোটা কাগজের ওপর আঁকা — পেন্সিলে, কালিতে, রঙিন পেন্সিলে, কোনোটা শুধু রেখা, কোনোটায় আলো-ছায়াও আছে। নগ্ন যুবতী, আঁটো নিটোল শরীর তার, লম্বা কালো চুল — কত ভাব, কত ভঙ্গি, শুয়ে, ব'সে, আধো শুয়ে, মুখোমুখি, আড়াআড়ি, পেছন থেকে, মুখ ফিরিয়ে, মুখ লুকিয়ে, মুখে হাসি বিষাদ কৌতুক বিস্ময় বেদনা — যেন একটা লম্বা গল্প বলা হচ্ছে, ভাঁজে-ভাঁজে খুলে যাচ্ছে কারো জীবন, মন, মনের ভাবনা। এই যে, একটা নৌকোও দেখা যাচ্ছে — বাঁকা জল, বাঁকাচোরা নৌকো, আঁধার-মতো, অনেক দূরে আকাশ

নুয়ে পড়েছে জলের ওপর — ছবির পর ছবিতে মেয়েটি যেন বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে : কখনো তাকে মনে হয় জলকন্যা, কখনো কোনো অদ্ভুত গাছ যা সমুদ্রের তলে বেগনি আর হলুদ রঙের ফুল ফোটায়, কখনো এক ফুলে-ওঠা ঢেউ যা একটু পরেই নিজের ফেনায় মিলিয়ে যাবে, আর কখনো যেন কাঠের শক্ত পাটাতনের ওপর এলিয়ে থাকে এক অন্তহীন অতি কোমল আকাঙ্ক্ষা। এগুলো তাঁর আসল ছবিরই নকশা তাহ'লে, নাটকের আগে রিহার্সেলের মতো ? হঠাৎ একটি ছবিতে আমি নিজের মুখের আদল পেলাম, আর-একটাতে — পর-পর অনেকগুলোতে। তবে কি এই ছবিগুলো আমারই, আমাকেই আঁকা হয়েছে ? এই ছবির মেয়েটার শরীর — তা কি আমার ? ঐ মেয়েটা, সে কি আমি ? কিন্তু অবনী যেটা এঁকেছিলো সেটাতে আমাকে কত বেশি চেনা যায়। 'ওটা শাড়ির ছবি হয়েছে, তোমার ছবি হয়নি।' কিন্তু এটাও তো ঠিক আমার ছবি নয়। আমি — অথচ আমি নই ; আমারই মতো, অথচ আমাকে ছাড়িয়ে কোন দূরে চ'লে গেছে : মায়াবিনী, তুমি কে ?

'ওখানে কী করছো, শ্যামলী ?' — গম্ভীর গলা শুনলাম আমার পেছনে, কেঁপে স'রে এলাম। তিনি এগিয়ে এসে গুছিয়ে রাখলেন ছবিগুলো, আমার দিকে না-তাকিয়ে বললেন, 'এই টেবিলে হাত দিয়ো না।' তারপর একটু হালকা গলায়, 'এসো, কাজ শুরু করা যাক। আমাব একটু দেরি হ'য়ে গেলো।' আমি কথা না-ব'লে চ'লে এলাম

পর্দা-ঘেরা ড্রেসিংরুমে, উজ্জ্বল আলো জ্বেলে মস্ত লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম জামা-কাপড় থেকে। প্রথম বার, জীবনে এই প্রথম বার নিজেকে দেখলাম, তাকিয়ে দেখলাম আয়নায় মধ্যে, মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, উন্মোচিত, সম্পূর্ণ। অন্যদিন কোনোমতে আলখাল্লার মতো জামাটা জড়িয়ে বেরিয়ে আসি, তারপর নিজেকে ভুলে যাই (অন্তত তা-ই মনে হয় আমার), কিন্তু সেদিন আমি দেরি করলাম, যেন চোখ ফেরাতে পারছি না আয়না থেকে, মনে হচ্ছে এ তো আসলে ভুলে যাওয়া নয়, খুঁজে পাওয়া। নিজেকে খুঁজে পেলাম আমি, এতদিনে, জানলাম এই শরীরটা আমার অপরাধ নয়, গৌরব, জানলাম আমি সুন্দর — হ্যাঁ, আমি। কিন্তু সেই ছবির মেয়েটা : তার তুলনায় ? কী আছে তার — কিন্তু কিছু কি নেই, যা আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, আমার মধ্যে খুঁজে পাবো না কোনোদিন ? কিন্তু — সে তো ছবি, শুধু ছবি, তার রূপ তো ভেল্কি, ভানুমতীর খেল — চোখে দেখে যতই না সত্যি মনে হোক। যা শুধু ও-রকম ব'লে 'মনে হয়', আর যেটা আসলেই তা-ই : এ-দুটোতে কত বড়ো প্রকাণ্ড তফাৎ ! আমরা মেঘের মধ্যে দৈত্য দেখি কত সময়, ফাটা দেয়ালে মানুষের মুখ দেখতে পাই — ছবিও তেমনি, তা ছাড়া আর কী। কিন্তু আমি — শ্যামলী, শ্যামলী সিংহ — আমি বেঁচে আছি, আমার নিশ্বাস পড়ছে, আমাকে ছুঁলে টের পাওয়া যাবে তাপ, কোমলতা, শিহরন ; যা-কিছু ঐ অন্যজনে শুধু

'দেখানো' হচ্ছে; তার প্রাণপাখি লুকিয়ে আছে আমারই খাঁচায়। আমার গর্ব হ'লো, জয়ী মনে হ'লো নিজেকে, আর তারপরেই, আমাকে যেন বিদ্যুতের মতো কেঁড়ে দিয়ে, আমার মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো সেই পাপচিন্তা। আমি শিউরে উঠে স্তব্ধ হলাম, নড়তে পারলাম না।

— উনি, ঐ যে আলোক পাল না কী নাম, উনি কি মানুষ? উনি কি পুরুষ? ওঁর কি রক্তমাংসের শরীর আছে, না কি নেই? ঐ সব ঘেন্নার ব্যাপার, অম্বু, আর দোলন যাদের কথা বলেছিলো, আর ট্রামে-বাস্-এ বিতিকিচ্ছিরি এক-একটা লোক, যেন ছুলুম-ছুলুম কী ক'রে ছুঁয়ে দেবে, ভিড়ের সুযোগে হুমড়ি খেয়ে পড়বে গায়ের ওপর, নোংরা, গা-ঘিনঘিন করে ভাবতে — কিন্তু তাতেও তো বোঝা যায় ঐ একটা লোভ পুরুষের কী ভীষণ উগ্র ('শ্বশুর ভাসুর কাউকেই বিশ্বাস নেই'), যার জন্য একেবারে বুড়ো হ'য়ে না-যাওয়া পর্যন্ত অত সাবধানে থাকতে হয় মেয়েদের। কিন্তু উনি — জিগেস করি, উনি কি পাথর? রোজ দেখছেন আমাকে, সপ্তাহে তিনদিন, দু-ঘণ্টা ক'রে — যে-ভাবে কেউ আমাকে দ্যাখেনি কোনোদিন (না, অমন উজ্জ্বল আলোয় অবনীও না), যে-ভাবে আমি নিজেও নিজেকে আজকের আগে দেখিনি। দেখছেন, আর আঁকছেন; আঁকছেন, আর দেখছেন — আর-কিছু না, কিছুই না, অথচ কী অসহায় আমি এখানে, কী নীরব নির্জন এই স্টুডিও, জগৎ-সংসারের বাইরে। তীক্ষ্ণ চোখ, ছোটো-হ'য়ে-যাওয়া, ঝকঝকে ছুঁচের মতো, ছুরির মতো —

কাকে দেখছেন সেই চোখ দিয়ে? কী দেখছেন? রোগীর পেট চিরে ফেলে ছুরি হাতে নিয়ে ট্যুমারটা পরীক্ষা করছেন ডাক্তার — তেমনি। যেন আমি একটা জিনিশ, গাছের গুঁড়ি, শামুকের খোলা বা কোনো অদ্ভুত সামুদ্রিক জীব বা আলপিনে-বেঁধা চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি। অপমান — অসহ্য অপমান! এমন অপমান কখনো কেউ করেনি আমাকে — শান্তি-মাসি না — না, আমি চীৎকার ক'রে বলবো এ-কথা — অম্বুও না। অম্বু অন্তত স্বীকার করেছিলো আমার অস্তিত্বটাকে। আর এঁর কাছে — রং তুলি পেন্সিল ক্যানভাস, তেমনি আর-একটা সামগ্রী হলাম আমি। একটা পদার্থ, বলতে গেলে জড়পদার্থ, তাকে উনি খেয়াল-খুশিমতো ব্যবহার করবেন। একটা জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে এ-রকম খেলা যে খেলতে পারে তার মতো অমানুষ আর কে আছে!

সেদিন যেন নতুন ক'রে লজ্জা হ'লো আমার — না, লজ্জা নয়, রাগ, আক্রোশ। সেই মেরুন সোফাটায় আর আমার স্বস্তি নেই; নৌকো, জল, মুনি, সত্যবতী, সব অর্থহীন হ'য়ে গেছে, আমি আর ভুলে থাকতে পারছি না নিজেকে, আমার এই শরীরটাকে। আমি তাকাতে পারছি না, আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছে, বিদ্রোহ করছে আমার শরীরের প্রতি রক্তকণা। আমার একটা জীবন ছিলো, আছে, মোটের ওপর সুখের জীবন বলা যায়, অন্তত সুস্থ, স্বাভাবিক, — সেটাকে, জিগেস করি, সেটাকে উনি তছনছ ক'রে দিলেন কেন? আর আমিই বা কেন ঐ ক্ষমতা দিলাম তাঁকে, কেন আমার এমন অবস্থা

হ'তে দিলাম যে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারি না? না — আমি চুপ ক'রে থাকবো না — আমি প্রতিশোধ নেবো। ওৎ পেতে থাকবো কোনো দুর্বল মুহূর্তে আলোক পালকে ধ'রে ফেলার জন্য। একবার — অন্তত একবার আমি দেখতে চাই যে উনি পাথরে তৈরি নন, ওঁর শরীরেও রক্ত-চলাচল করে। না — আমি ওঁর ছবি হ'তে চাই না, জগতের সব ছবির চাইতে আমার কাছে বেশি মূল্যবান· ·কী? মনে-মনেও এই প্রশ্নেব উত্তব আমি দিতে পারি না, যেন আঁৎকে উঠে থেমে যাই হঠাৎ।

একটা ইচ্ছে ন'ড়ে উঠলো আমার মনে, দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠলো জাদুকরের তৈরি গাছের মতো। তা-ই কববো? তা-ই করতে হবে। কখনো তো নির্দিষ্ট তিনটি দিনে ছাড়া দেখিনি তাঁকে, কখনো তো এমন কোনো অবস্থায় দেখিনি যখন তিনি তাঁর ছবিতে বুঁদ হ'য়ে নেই। হঠাৎ গিয়ে পড়লে কেমন দেখবো? নিশ্চয়ই অন্য সময়ে তিনি সাধারণ মানুষ -- অন্য সকলেরই মতো? ছল-ছুতোর অভাব নেই; বলা যায় আমার স্বামী শিলিগুড়িতে বদলি হলেন, আমি আর আসতে পারবো না (তখন তাঁর মুখের চেহারা কেমন হবে?); এমনকি, একটু সাহস ক'রে, সত্যি কথাটাই বা বলা যাবে না কেন, 'হঠাৎ খুব ইচ্ছে করলো' (তখনই বা তাঁর মুখের চেহারা কেমন হবে?)। সেদিন বেস্পতিবার ছিলো, আমার যাবার কথা নয় — এ-ই সুযোগ। আমি বেশিক্ষণ ভাবলাম না পাছে ঝোঁকটা কেটে যায়, আমার মনে হ'লো বাস্ যথেষ্ট

জোরে চলছে না, কিন্তু অবশেষে এলো ম্যুজিয়মের মোড়। সদর স্ট্রিটে ঢুকে কয়েক পা মাত্র হেঁটেছি, এক আশাতীত দৃশ্যে আমার চলা থেমে গেলো। উনি বেরোলেন বাড়ি থেকে, একা নন — সঙ্গে একটি — মহিলা, মেয়ে, স্ত্রীলোক, কী বলবো জানি না। খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দু-জনে, আস্তে হাঁটছেন, ঠোঁট নড়ছে, ঠোঁটে-চোখে হাসি। আমি একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ওঁরা কাছে এলেন, আমি আমার চোখের সবটুকু শক্তি দিয়ে দেখতে লাগলাম অন্যজনকে — ছাঁটা চুল, প্রসাধন একটু উগ্র ধরনের, শাড়িটা এমন ক'রে প্যাঁচানো যেন গা ফেটে যাবে। বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে-কোনো একটা হ'তে পারে, বাঙালি না ফিরিঙ্গি না অন্য কোনো জাতের, তাও বোঝার উপায় নেই। আমার কানে দু-একটা কথা এলো — ইংরেজি — না, বোধহয় ইংরেজিও নয়, অন্য কোনো ভাষা যা আমার একেবারেই অচেনা। হঠাৎ আলোক পাল দেখতে পেলেন আমাকে — না, ওকে দেখতে পাওয়া বলে না, চলা না-থামিয়ে আধখানা চোখে তাকালেন কি তাকালেন না, ওপর থেকে নিচে ইঞ্চিখানেক নামলো তাঁর মাথা। অর্থাৎ, 'ভবসংসারে তোমার অস্তিত্ব আছে তা স্বীকার করছি।' চৌরঙ্গির মোড়ে ট্যাক্সি নিলেন ওঁরা, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ। কেন আমি এ-রাস্তায়, তাঁরই কাছে আসছিলাম কিনা — তাও কি মনে হ'তে নেই? একটা কথাও কি বলা যায় না সেই মানুষটার সঙ্গে, যাকে অতক্ষণ ধ'রে অমনভাবে তিনি দুই চোখে লুঠ ক'রে নেন? — মিথ্যাবাদী! সারাদিন

শুধু ছবি আঁকেন! ঘরে ব'সে থাকেন! কারো সঙ্গে মেলামেশা নেই! মিথ্যাবাদী! জোচ্চোর! সেদিন রাত্রে অবনীর বুকে মুখ চেপে কেঁদে ফেললাম আমি, সে অস্থির হ'য়ে উঠলো আমার কী হয়েছে তা জানবার জন্য, তাইতে আরো উদ্বেল হ'লো আমার কান্না। 'কেঁদো না, কমলা, কেঁদো না,' আমাকে আদর ক'রে-ক'রে বলতে লাগলো সে, 'আমি বুঝতে পারি তোমার কষ্ট, আমিও মানি বিয়েটা এবার হ'য়ে যাওয়া দরকার, মা-কে আমি বলবো সব কথা— শিগগিরই — কালই — এই টানাটানিও আর ভালো লাগছে না আমার, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে, এবারে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' আমি শান্ত হবার পরে বললো, 'জানো, সেই চাকরির কথাটা এখনো ধ'রে ব'সে আছেন ওঁরা। ভাবছিলাম আপাতত নিয়ে নেবো নাকি। তুমি কী বলো?' সে আমার মুখে যা শুনতে চাচ্ছে তা-ই বললাম আমি, 'ভালো তো। খুব ভালো।' 'তুমি ভালো বলছো?' 'দ্যাখো না কেমন লাগে। পছন্দ না-হ'লে ছেড়ে দিতে তো মুশকিল নেই। আর তাছাড়া — যদি তুমি তোমার সত্যিকার ছবি আঁকতে চাও, তাহ'লে চাকরি ক'রেও কি আর সময় পাবে না?' 'ছবি? আমার সত্যিকার ছবি? কী জানি।' একটু চুপচাপ কাটলো, তারপর হঠাৎ আমি আকুল হ'য়ে ব'লে উঠলাম, 'না — ছবি না, আমি ছবি চাই না, আমি তোমাকে চাই!' বলতে-বলতে তার মাথাটা টেনে আনলাম আমার বুকের ওপর, সে-রাতে তাকে তীব্রভাবে ভালোবাসলাম।

১৬

কিন্তু থাক, কমলা, এ-সব আর কেন, এ-সব আর ভেবো না। দ্যাখো তোমার চারদিকে তাকিয়ে। সন্ধে হ'লো, আলো জ্বলছে, কথায় হাসিতে শাড়ির জৌলুশে রমরমে ঘর, তোমার আত্মীয়া এঁরা সবাই, আজ থেকে তুমি এঁদেরই। কাছে এলো বিয়ের লগ্ন, সারা বাড়ি মুখর, শানাই আরো জোরালো। তুমি বসেছো মেঝের ওপর চিকনপাটিতে, এঁরা তোমাকে গোল হ'য়ে ঘিরে আছেন, তোমাকে সাজানো হচ্ছে। কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে। মুখ নিচু ক'রে থেকো না, তাকাও, আর তো তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। সুখী হও, কমলা, কৃতজ্ঞ হও, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে প্রণাম করো। এত হাসি, এত আনন্দ, আয়োজন — সব তোমার জন্য। কিন্তু একটু দুঃখও থাকে বিয়ের দিনে যেহেতু মেয়েদের পক্ষে বিয়ে মানে শুধু মিলন নয়, বিদায়, ছেড়ে যাওয়া। সেটুকু কষ্ট, সেটুকু কান্না, তাও নেই তোমার। এক তীর থেকে অন্য তীরে নয়, সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠলে। নয় পদ্মার চর, যা রাতারাতি বন্যায় ডুবে যেতে পারে, নয় কোনো অবিশ্বাসী চোরাবালি, এখন শক্ত মাটি তোমার পায়ের তলায়। ক-টা মেয়ের তোমার মতো ভাগ্য হয়?

আমার মতো ভাগ্য ক-টা মেয়ের হয়? সব পেরিয়ে, সব সত্ত্বেও, আমার জন্য এই সুখ জমা ছিলো। কোথায় আমি নামিয়ে এনেছিলাম নিজেকে, কত নিচে, নয়তো সেদিন একটি

স্ত্রীলোকের হাত ধ'রে তাঁকে বেড়াতে দেখে আমার মনে শেল বিঁধবে কেন? কিন্তু শুধু শেলই বেঁধেনি, আশাও জেগেছিলো — এমনি আমার মনের বিকার। একেবারে ব্রহ্মচারী সন্নেসি নন তাহ'লে? তাই, যতই না ধিক্কার দিই নিজেকে, আবার সেখানে না-গিয়ে পারি না। তেমনি, সপ্তাহে তিন দিন। আমি টের পাই আমার রক্ত আমার সারা শরীরে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, নিশ্বাস ঘন, টের পাই আমার বুকের মধ্যে দুরুদুরু। ভাবি সেই মুনির কথা, যখন নৌকোয় যেতে-যেতে তাঁর চোখ পড়লো জেলেনির ওপর, আকাশের তলায়, রোদ্দুরে মাখা প্রকাণ্ড সেই দিনটিতে। দাঁড় টানছে মেয়েটি, সুন্দর ভঙ্গিতে, তার উঁচু-নিচু শরীরটিকে দুলিয়ে-দুলিয়ে, জলের ছপাছপ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আর ভাবি সত্যবতীকে, মুনি যখন কুয়াশায় দশ দিক ঢেকে দিলেন, আর তার পরিশ্রমী সক্ষম শরীরটি অবশ হ'য়ে এলো আস্তে-আস্তে। আমার চোখ নিবদ্ধ হয় তাঁর মুখের ওপর — আশায়, অপেক্ষায়। এমন কি কখনো হবে না যে তিনিও দেখতে পাবেন আমাকে — এই আমার সুন্দর শরীর, যার খবর আয়না আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, যার ভেতরে ধ্বকধ্বক করছে এঞ্জিনের মতো হৃৎপিণ্ড? একদিন তিনি হঠাৎ বললেন, 'তোমার চোখের ভাবটি সুন্দর হচ্ছে আজকাল, এবার আমি পেয়ে গিয়েছি।' আমার চেঁচিয়ে ব'লে উঠতে ইচ্ছে করলো, 'কিন্তু আমি কী পেলাম, দিনের পর দিন চেপে-রাখা দীর্ঘশ্বাস আর বলতে-না-পারা কষ্ট ছাড়া আর কী পেলাম আমি?'

উলুধ্বনি, শাঁখের ফুঁ, সোরগোল, মেয়েদের দল ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এগিয়ে আসছে। 'সুন্দর বৌ হয়েছে।' 'মস্ত খোঁপা — ভেতরে ফল্‌স্‌ নেই তো?' 'গড়নপেটন দিব্যি।' 'চোখ ভালো।' বাইরে পুরুষের গলা শোনা গেলো, 'কনেকে নিয়ে এসো, আসরে বর এসে গেছে।' 'এক মিনিট — আর ছুটো ফোঁটা দিয়ে দিই — এই ওড়নাটা জড়িয়ে দে তো, বিনু, গাছকৌটো হাতে দিতে ভুলিস্‌ না।' 'এই পিঁড়িটায় এবার বসতে হবে, বৌমা — এসো।' আলপনা-আঁকা পিঁড়ি সুদ্ধু তাকে তুলে ধরলো চারটি জোয়ান ছেলে, ছাদে এনে বসিয়ে দিলো। এখানেও ভিড়, উজ্জ্বল আলো, আনন্দ। একপাশে পুরুৎঠাকুর, আর-এক পাশে সম্প্রদান করার জন্য তৈরি হ'য়ে ব'সে আছেন তার দমদমের দাতু! আর তার মুখোমুখি — নতুন বেশে অত্যন্ত চেনা একটি মানুষ। সব আজ নতুন। নতুন একটা জন্মের মতো মনে হচ্ছে, না কমলা? এখন কী এসে যায় তোমার, যদি কোনো-এক আলোক পাল (যাঁকে তুমি বলতে গেলে চেনোই না) অনেক দূরে অন্য শহরে চ'লে গিয়ে থাকেন? কী এসে যায়, যে সারা জীবনে আর কখনো তাঁকে চোখে দেখবে না তুমি?

বিয়ে, তার বিয়ে হচ্ছে। অবনীর সঙ্গে। জীবনের মতো বাঁধা পড়লো তারা, জীবনের মতো। আমি ভালোবাসি অবনীকে, সে আমাকে ভালোবাসে। পুরুৎঠাকুর মন্ত্র পড়ছেন। আমরা হাতের ওপর হাত রেখেছি। এবারে আমি মা হ'তে পারবো, অবনী আর আপত্তি করবে না। আমরা শিগগিরই

উঠে যাবো বালিগঞ্জে, অবনী ফ্ল্যাট নিয়েছে সেখানে। আমরা গুছিয়ে বসবো, ঝকঝকে নতুন আসবাব দিয়ে বাড়ি সাজাবো, সোফার সঙ্গে কুশানের আর তার সঙ্গে পর্দার রং মিলিয়ে-মিলিয়ে। শোবার ঘরে রেডিও, খাবার ঘরে রেফ্রিজরেটর। ফ্ল্যাটটা আমাকে দেখিয়ে এনেছে অবনী, চমৎকার। অবনীর ইচ্ছে পর-পর দুটি সন্তান — একটি ছেলে, একটি মেয়ে ; কিন্তু যদি দুটিই মেয়ে হয়, বা ছেলে ? তাহ'লে আর-একবার চেষ্টা করতে হবে বইকি। বেশ সুবিধে হয়েছে, ইচ্ছেমতো গোনা-গুনতি সন্তান পাওয়া যায়, ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা বেছে নিতে পারলেই একেবারে নিশ্চিন্তি হওয়া যেতো। তাও নাকি পারা যাবে শিগগিরই — কী কাণ্ড ! অবনীর আপিশ সাড়ে-ন'টা থেকে সাড়ে-পাঁচটা, পুরো শনিবার ছুটি। আধা-বিলিতি আপিশ, টিকে থাকলে দু-হাজার আড়াই হাজার পর্যন্ত মাইনে হ'তে পারে। আমি দুপুরে শুয়ে-শুয়ে সিনেমা-পত্রিকার পাতা ওল্টাবো, অনুরোধের আসর শুনবো, ঘুমুবো, পাশের ফ্ল্যাটের বৌটির সঙ্গে ভাব হবে আমার, তার স্বামী অবনীর বন্ধু, ফ্ল্যাটের খবর ওরাই দিয়েছিলো। আমার এক অল্প-বয়সী মাস-শাশুড়ি থাকেন হিন্দুস্থান্ রোডে, গড়িয়াহাটে এক পিসতুতো ননদ — তাদের সঙ্গেও ভাব হবে আমার। মাঝে-মাঝে নেমন্তন্ন হবে বাড়িতে — অবনীর বন্ধুবান্ধব, আমাদের আত্মীয়স্বজন, এমনি ভাগ ক'রে-ক'রে। মাঝে-মাঝে আমরা বীডন স্ট্রিটে বেড়াতে যাবো। ছুটি-ছাটায় রাঁচিতে। পুরীতে। দার্জিলিঙে। মাঝে-মাঝে ঝগড়া হবে আমার সঙ্গে অবনীর, যেমন সব স্বামী-

স্ত্রীতে হয়; কোনো-এক রাত্রে ঝগড়া মিটে যাবে, যেমন সব স্বামী-স্ত্রীর মিটে যায়। আমার শাশুড়ি বলেছেন ভাগাভাগি ক'রে দু-বাড়িতেই থাকবেন এখন থেকে; কখনো আমাদের কাছে, কখনো বীডন স্ট্রিটে। আমার খুড়শ্বশুরের ছেলে-মেয়েদেরও বড্ড ভালোবাসেন উনি, ভারি স্নেহশীল মানুষ, আমার খুড়শাশুড়ি তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। সুন্দর পরিবার — বেশ মিল-মিশ আছে নিজেদের মধ্যে — আর কেনই বা থাকবে না, সকলেই সচ্ছল; অল্পস্বল্প হিংসুটেপনা থাকলেও ঝগড়াঝাঁটি নেই। এরই মধ্যে অবনী একটু অন্য রকম — হ'তে চেয়েছিলো, কিন্তু আমার ভাগ্যে তারও সুবুদ্ধি জাগতে বেশি দেরি হ'লো না। আমার খুড়শ্বশুরের মেজাজ একটু কড়া, কিন্তু পাকা বুদ্ধিব লোক — পৈতৃক বিত্ত রাখতে গেলে, বাড়াতে গেলে ঐ রকমই দরকার হয়, হাওয়ায়-ওড়া ফানুস হ'লে চলে না। আমি বুঝতে পারি অবনীর ওপর আসলে তেমন রাগ নেই ওঁর (কিছুটা বাড়াবাড়ি অবনীর দিক থেকেই হয়েছিলো বোধহয়); উনি শুধু চেয়েছিলেন অবনীকে একটা বাঁধা কাজের মধ্যে ফেলে দিতে, আর সত্যিকার হিতৈষীর পক্ষে সেটাই তো ঠিক কাজ। আমার খুড়শ্বশুর নাকি আমার শাশুড়িকে বলেছেন তাঁর বালিগঞ্জের জমিতে আস্তে-আস্তে এবার বাড়ি তুলে নিতে — তার মানে আমরা নিজের বাড়িতে উঠে যেতে পারি শিগগিরই, তখন আমি শাশুড়িকে বলবো বারোমাস আমাদের কাছে থাকতে। কী হচ্ছে? ধোঁয়া

কেন? ও, পাঁকাটি দিয়ে আগুন জ্বেলেছে, বিয়ে হ'য়ে গেলো, যজ্ঞ হচ্ছে এবার। কত কিছু ব্যাপার, আড়ম্বর, ঘনঘটা — কিন্তু আসল কথাটা কী? একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে একসঙ্গে শোবে — এ ছাড়া আর কিছু তো নয়। হঠাৎ একদিন সবাই মিলে ব'লে উঠলো, 'যাও, ঢোকো ঐ ঘরে, কোনো ভয় নেই — আমরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।' কেমন মজা লাগে না ভাবতে? অথচ ঐ একই কাজ বিয়ের আগে কেউ ক'রে ফেললে কী কেলেঙ্কারি! আমারও কত ভয় — অবনীর সঙ্গে এমনি-এমনি ছিলাম যতদিন। আজ নিশ্চিন্ত। সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত। মাস কাটবে, বছর কাটবে, আমাদের ছেলেমেয়ে দুটি স্কুলে যাবে, বড়ো হবে, তাদের বিয়ে হবে। হয়তো, পঁচিশ বছর পরে, এই ছাতেই এমনি ধুমধাম ক'রে বিয়ে হবে আমার মেয়েব। বা হয়তো বালিগঞ্জে আমার শাশুড়ির, মানে অবনীর, মানে আমার বাড়িতে। তখন আমি কেমন দেখতে হয়েছি? বেশ মোটা নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, আমার মোটার ধাত, আমার মা-রও তা-ই ছিলো। আর ঐ যে অবনীর ঝাঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথাটা, সেটাতেও হয়তো টাক পড়বে তখন — ওর কাকারই মতো? কিন্তু আমরা দেখতে কেমন, সে-কথা তখন অবান্তর হ'য়ে গেছে। এখনই অবান্তর হ'য়ে গেছে। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, না বাসি না, তাও অবান্তর। আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমার পিসতুতো ননদের সঙ্গে তিনটের শো-তে সিনেমা দেখে আমি

যে-বাড়িতে ফিরে আসি, অবনীও সেখানে ফেরে আপিশ থেকে। কোনো লুকোচুরি নেই, সমস্যা নেই। যে-বিছানার বাঁ দিকে আমি ঘুমোই, তারই ডান দিকে ঘুমোয় অবনী। আমার অসুখ করলে অবনীর দুশ্চিন্তা আর অসুবিধে হয়, তার মাইনে বাড়লে আমি কোনো শখ মেটাতে পারি। আমি যাদের জন্ম দেবো, অবনীও তাদের জন্ম দেবে। স্বামী-স্ত্রী, অমুক-অমুকের বাবা আর মা। দেখামাত্র চিনে নেয় সবাই, শোনামাত্র মেনে নেয়। এ-ই যথেষ্ট, এ-ই সব, এর ওপরে আর-কোনো কথা নেই। আঃ — এতদিনে — এতদিনে সত্যিকার জীবন!

সত্যিকার জীবন, সত্যিকার বিয়ে। গাঁটছড়া বেঁধে বাসর ঘরে তারা: সে আর অবনী। সেই তেতলার ঘর, যেখানে ,রাদিন বসিয়ে রার্খা হয়েছিলো কমলাকে। চাল খেলা, কড়ি খেলা, শোলার ফুল জলে ভাসানো — কিছু বাদ গেলো না। কিন্তু অবশেষে সব শেষ হ'লো, রাত নিশুতি, ক্লান্তি আর নীরবতা নামলো বাড়িতে, এতক্ষণে অবনীর সঙ্গে তার দেখা হ'লো। হাসলো অবনী তার চোখে চোখ ফেলে। 'তোমার কেমন লাগছে, কমলা?' 'কেমন লাগছে? বলতে পারবো না কেমন।' 'খুব ক্লান্ত — না। সত্যি, হিন্দু বিয়ে এক অত্যাচার। এসো, শুয়ে পড়া যাক।' 'আসছি।' কমলা বসলো ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে, ঝকঝকে নতুন আয়নায় নিজেকে দেখলো পুরোপুরি নতুন বৌ — সুখী, আনকোরা, ঝলমলে। তার সব অতীতকে ঢেকে রেখেছে এই

বিয়ের সাজ। গায়ের গয়নাগুলো একে-একে খুলতে লাগলো কমলা। কানপাশা, নেকলেস, চিক, দু-হাতে ছ-গাছা ক'রে চুড়ি, বাঁ হাতে মোটা কঙ্কণ, কনুইয়ের ওপর আর্মলেট, মাথায় সোনার সিঁথি পর্যন্ত। যাকে বলে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। মুড়ে দিয়েছে — সোনায়, সাটিনে, রেশমে, সোনালি-চুমকি-বসানো টুকটুকে লাল বেনারসিতে। এ-সবে সুন্দর দেখায়, এ-সবে আরো সুন্দর দেখায় মানুষকে। কিন্তু অন্য এক সুন্দরকে আমি দেখেছিলাম, অন্য এক আমাকে আমি দেখেছিলাম। অন্য কোথাও, অন্য কোনো আয়নায়। না কি একটা লম্বা স্বপ্ন দেখছিলাম জেগে-জেগে? কেমন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেলো। কেমন হঠাৎ আলগোছে বললেন, 'শ্যামলী, আমি চ'লে যাচ্ছি।' আমি ভাবলাম কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যাচ্ছেন বোধহয়। 'কোথায় যাচ্ছেন।' 'যেখানে ছিলাম, সেখানেই। প্যারিসে।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'কেন, সেখানে কেন?' উনি বোধহয় শুনতে পেলেন না কথাটা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা চিঠি পড়ছিলেন, সেটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'পর্শু যাচ্ছি।' আমার বিশ্বাস হ'লো না কথাটা, একটু কাছে এগিয়ে বললাম, 'পর্শু কী ক'রে যাবেন?' 'প্লেনে উঠে বসবো, চ'লে যাবো।' আমি অবাক হলাম তাঁর হালকা সুরে, যেন দুম ক'রে অতদূরে চ'লে যাওয়াটা ভারি আনন্দের ব্যাপার। 'আপনার ছবি যে শেষ হয়নি?' 'তা একরকম শেষই বলা যায়, দু-একটা খুচরো কাজ বাকি রইলো, তা ওখানে গিয়েও করা যাবে।' 'আবার কবে

আসবেন ?' 'আবার — এই কলকাতায় ? ঠিক নেই কিছু।' একটু পরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজই যাওয়া ঠিক করলাম, তাই আগে তোমাকে জানাতে পারিনি। কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধে হবে না — এই একটা ঠিকানা দিচ্ছি, এখানে গেলে ভালো কাজ পাবে।' তাঁর একটা নাম-ছাপানো একটা কার্ডের পেছনে লিখে দিলেন এক লাইন। 'তুমি খুব ভালো মডেল, শ্যামলী, আমার ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম। আচ্ছা, তাহ'লে...' এতক্ষণে আমার উপলব্ধি হ'লো যে আমি এতক্ষণ উপলব্ধি করিনি ব্যাপারটা, কিছু না-বুঝে কথা শুনছিলাম, বলছিলাম। চ'লে যাচ্ছেন — অন্য দেশে — অনেক দূরে — পর্শু। পর্শু... তার মানে ... আজ শুক্রবার ... আজই শেষ, এই মুহূর্তেই শেষ। আমি একটা চেয়ারের পিঠ ধ'রে দাঁড়ালাম, মনে হ'লো আমি খুব দুর্বল হ'য়ে গিয়েছি, আমার বুকের ভেতরকার কলকজাগুলো খুলে নিয়েছে, এই ঘরের আলোগুলো তেমন উজ্জ্বল নেই আর, আলোক পালের মুখটাও কেমন অস্পষ্ট। উনি কাশলেন একবার — অর্থাৎ, আমার যাবার জন্য ইঙ্গিত। অন্য একটা কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো, চেষ্টা ক'রে কথা বের করলাম গলা দিয়ে — 'ছবিটা দেখতে পারি একটু ?' 'দেখতে চাও ? আচ্ছা।' তিনি ঢাকনা খুলে দিলেন, আমি একটা চোখ-ধাঁধানো ঝলক দেখতে পেলাম।

কী দেখেছিলাম, স্পষ্ট মনে নেই। আকাশ, কুয়াশা, নদী : ঝাপসা। ফোঁটা-ফোঁটা নীল, বেগনি, হলুদ : চুঁইয়ে-পড়া

াটা-ফোঁটা রোদ্দুর, ঈষৎ কাঁপছে যেন, কুয়াশা কেটে
:চ্ছ। কিছু-একটা ভেসে-ভেসে উঠছে, নৌকোর মতো,
াকি নদীর ঢেউ কে জানে। কিন্তু সেই ঝাপসার মধ্যে
াথায় একটু ফুটো, যেন এক চিলতে আকাশ ছিঁড়ে গেছে,
ার সেই ফাঁক দিয়ে দিনমণি সহস্র কিরণে ফুটিয়ে তুলেছেন
টাতনের ওপর মেয়েটিকে। কালো মেয়ে, জেলের মেয়ে,
র্ভ তার বেদব্যাস। শুয়ে আছে — সহজ, অলস, ভরপুর,
াচিত, আকাশের তলায় যমুনার বুকে উন্মোচিত। সুন্দর
ম, সত্যবতী, আমাকে ক্ষমা করো, আর আমি ঈর্ষা করি না
মাকে, মুনি তোমাকে দেবী ক'রে তুলেছেন — মুহূর্তের
়। এই এক আশ্চর্য মুহূর্ত তোমাব জীবনের — এর পরেই
মি সাধারণ, সাধাবণ। আমাকে অনুমতি দাও, মুহূর্তটিকে
গ ক'রে নিই তোমাব সঙ্গে। আমাকে বলতে দাও যে ঐ
' আমারও, তোমার চোখেব আলো আমারও। আমি
নি তোমাকে দেখতে গুণীমানীরা ভিড় করবেন, কিন্তু আমার
:ক কেউ ফিরে তাকাবে না কখনো। শুধু আমিই জানবো
আমাকে দিয়েই তুমি তৈরি হয়েছিলে — দিনের পর দিন,
[illegible] আমাকে নিংড়ে নিয়ে, যেমন তোমাকে নিংড়ে
শর। আরো একটা কথা আমি জানলাম যা
য়েছে না এখনো: এ-ই প্রথম, এ-ই শেষ, এর পরে আর
[illegible]াছে তুমি কেউ নও, কিছু নও। বেদব্যাসের মায়ের
কে মনে রেখেছে?
'কমলা।'